অরুণ-বহ্নি

শান্তি দাশ

বসুমতী সাহিত্য মন্দির
১৬৬. বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট. কলি: ১২

। বসুমতী সংস্করণ ।
১৩৬৪

প্রচ্ছদপট : শিল্পী শ্রীবিদ্যুত চক্রবর্তী

প্রকাশক : শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার
বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-১২

মুদ্রক : বিবেকানন্দ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা-৬

গ্রন্থক : শ্রীখলিলুর রহমান
১৬, পাটোয়ার বাগান লেন, কলিকাতা-৯

স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির মতই সর্বংসহা
বিপ্লবী বাঙলার মায়েদের কথা স্মরণ ক'রে
বইখানি আমার মাকে
উৎসর্গ করলাম

রাত্রির তপস্যা

রক্ত-বিপ্লবের পথে মাতৃভূমির শৃঙ্খলমোচনের সাধনায় বাঙলার মেয়েদের দানও তুচ্ছ নয়। অমারাত্রির অন্ধকারে অন্তরে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে সেই প্রাণ-দেওয়া-নেওয়ার দুর্গম পথে ও পরীক্ষায় বাঙলার মেয়েরাও বেরিয়ে এসেছিল। মুক্তিযজ্ঞের হোমাগ্নিতে সর্বপ্রিয়-বস্তুকে ইন্ধন ক'রে আত্মদানের পূর্ণাহুতি দ্বারা ব্রতসাঙ্গ করার সাধনায় তারাও কোনদিনই পিছনে পড়ে থাকেনি। সেই রাত্রির তপস্যায় খ্যাতির মোহ বা কীর্তির প্রত্যাশা ছিল না। তাদের বিপ্লবী-জীবনের কাহিনী শোনাবার আমন্ত্রণ আসবে নিখিল-ভারত বেতার-কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে, এ ছিল একেবারেই কল্পনাতীত। কিন্তু ইংরেজ-শাসনমুক্ত ভারতবর্ষে তাই ঘটল।

সুদীর্ঘ চার বছর পরে এ কাহিনী পুস্তকাকারে স্বাধীন ভারতের নাগরিকদের হাতে তুলে দিতে গিয়ে মনে হ'ল যে, আমার বিপ্লবী-জীবনের সূচনা-পর্বের ওপর থেকে অপ্রকাশের যবনিকা যদি অপসারণ না করি তাহলে অসমাপ্ত থেকে যাবে এ-কাহিনী।

১৯৩১ সালের ১৪ই ডিসেম্বরের যে ঘটনাকে আশ্রয় ক'রে রচিত হয়েছিল আমাদের কারাজীবনের ইতিহাস, বলাই বাহুল্য, সে কোন একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্রই নয়। যে পদ্ম সহস্রদল হয়ে মাতৃপূজায় নিবেদিত হ'ল, একটি একটি ক'রে তার পাপড়িখোলার বিচিত্র ইতিহাস অবশ্যই রয়েছে। কী ক'রে আমাদের মনে স্বাধীনতা

আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার প্রেরণা জাগল, কী ভাবে বৈপ্লবিক দলের সঙ্গে ঘটল আমাদের সংযোগ এবং কী শিক্ষা আমাদের প্রস্তুত ক'রে তুলেছিল সেদিনকার সেই দুঃসাহসিক মহাব্রতে—এ সব প্রশ্ন বহুজনের কণ্ঠে বহুবার উচ্চারিত হয়েছে। একান্ত ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ উত্থাপনে স্বভাবতই কুণ্ঠা আসে। কিন্তু আমার জীবনের উন্মেষলগ্নে আমার ব্যক্তিসত্তা মিশে গিয়েছিল এমন এক সমষ্টি-সত্তায়—যার অগ্নিক্ষরা বাণী উনিশ শতকের তিনটি দশক ধরে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছিল ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে। আমার আত্মকথাও তাই সেই সমষ্টি-সত্তারই আত্মকথা, সে সময়কার বিপ্লবী-যুগচেতনা তার মধ্যে প্রতিবিম্বিত।

আমার জীবনে মাতৃমন্ত্রের প্রথম দীক্ষা পিতৃস্নেহে অভিসিঞ্চিত হয়েই এসেছিল। বাবা (স্বর্গত দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ) ছিলেন দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। ধীর-স্থির-গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। অন্তরে ছিল স্বদেশানুরাগের ফল্গুধারা। মহামতি গোখেলের তিনি ছিলেন ভাবশিষ্য ও সহকর্মী। তাঁর স্বদেশপ্রীতি ও জাতীয়-আন্দোলনের প্রতি অনুরাগ আমাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হ'ল তাঁরই চেষ্টায়। স্বদেশী গান গাওয়ার প্রেরণা পেলাম প্রথম তাঁর কাছেই। রোজ সন্ধ্যাবেলা তিনি দাদাকে আর আমাকে দুপাশে বসিয়ে গাওয়াতেন— 'ধনধান্যে পুষ্পেভরা', 'বঙ্গ আমার জননী আমার', 'ভারত আমার' —এমনি আরো কত জাতীয়-সংগীত। ঘরের দেয়ালে জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রতিকৃতি ছিল টাঙান। রাতের পর রাত তিনি তাঁদের জীবনকথা গল্পের মত ক'রে শোনাতেন আমাদের। কুমিল্লা অভয় আশ্রমের সঙ্গে তাঁর ছিল আন্তরিক যোগ। দুঃস্থ ও নিপীড়িত মানুষের সেবাকে তিনি স্থান দিতেন সবার ওপরে। তাঁর আদর্শের

সঙ্গে অভয় আশ্রমের উদ্দেশ্য ও কার্যবিধির সঙ্গতি ছিল ব'লেই অভয় আশ্রমকে তিনি সর্বতোভাবে সহায়তা করতেন। অভয় আশ্রমের নেতৃস্থানীয় যাঁরা তাঁদের সঙ্গে ছিল তাঁর গভীব সৌহার্দ্য। সেই সূত্রে তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ আমাদেরও ঘটেছিল বাল্যকালেই। তাঁদের কাছ থেকে শুনতুম তাঁদের আদর্শের কথা, বৈদেশিক শোষণমূলক শাসনের কথা এবং বিশেষ ক'রে এই দুর্গতি থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্যে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার প্রয়োজনের কথা।

বাবার দেশপ্রীতি ছিল তাঁর ধর্মের অঙ্গ। আমাদের মধ্যেও সেই ধর্মই যেন অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে এই ছিল তাঁর আন্তরিক কামনা। প্রত্যেক কাজে ও কথায় তিনি আমাদের মধ্যে জাতীয়তার মনোভাব সৃষ্টি করবার প্রয়াস পেতেন। মনে পড়ে একদিনকার ঘটনা। তখনকার ইংলণ্ডের যুবরাজ যখন ভারতবর্ষে আসেন তখন তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে বিপুল আয়োজন চলছে ভারতবর্ষের শহরে শহরে। আমরা তখন এলাহাবাদে, বায়ুপরিবর্তনের জন্য গেছি ছ'মাসের মেয়াদে। এই ছ'মাসও যাতে পড়াশুনার কোন ক্ষতি না হয় তাব জন্যে বাবা আমাকে ও দাদাকে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন সেখানকার স্কুলে। রাজপুত্রের আগমন উপলক্ষে আমাদের স্কুলেও অনুষ্ঠান হবে, বাজপুত্র স্বয়ং যোগ দেবেন সে অনুষ্ঠানে। 'ধ্রুব' নাটক হবে, আর ধ্রুবের ভূমিকায় অভিনয় করব আমি। মহড়া শেষ হয়ে গেছে, আমরা প্রস্তুত। কিন্তু রাজপুত্রের আসার আগের দিনই পণ্ডিত জওহরলাল হলেন কারারুদ্ধ। সমস্ত শহরে হরতাল, এলাহাবাদ শহর নিঝুম, নিস্তব্ধ। কিন্তু সরকারিমহলে আনন্দোৎসবের আয়োজন অব্যাহত। অনুষ্ঠানের দিন স্কুলের গাড়ি এসেছে আমাকে নিয়ে যেতে। বাবা ব'লে দিলেন, "ওরা স্কুলে যাবে না।" তবু গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে ছুটে মার কাছে গেলুম, যদি তিনি পারেন বাবার মত বদলাতে। বাবা অচল, অটল: "না, ওরা যাবে না স্কুলে। জওহরলাল জেলে, আর খোকাখুকী যাবে স্কুলে যুবরাজের মনোরঞ্জন

করতে। না, তা কিছুতেই হয় না।!"—সেদিন 'ধ্রুব' হ'তে না-পারার দুঃখ শিশুমনে গভীরভাবে বেজেছিল বৈ কি। কিন্তু বাবার গম্ভীর কণ্ঠস্বরও অন্তরে কম গভীর হয়ে বাজেনি।

আরেকটি দিনের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে। ১৯২৬ সাল সরোজিনী নাইডু এসেছেন কুমিল্লায়। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে এক বিরাট জনসমাবেশের আয়োজন হয়েছে। সেখানে উদ্বোধন-সংগীত গাইবার ভার পড়ল আমার ওপর। বাবাও সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। বাড়ি ফিরে তিনি আমার মাথায় হাত রেখে আদর ক'রে বলেছিলেন, "বড় হয়ে মিসেস নাইডুর মত হয়ো।" ছোট্ট একটি কথা, কিন্তু আমার অন্তরে তার প্রেরণা ছিল সুদূরপ্রসারী।

জাতীয় নেতৃবৃন্দের আগমন বা অন্য কোন জাতীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে সব জনসভার আয়োজন হ'ত তাতে অংশগ্রহণ করতে বাবা আমাকে উৎসাহিত করতেন। মনে আছে, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সম্বর্ধনা-সভায় খদ্দরের পোশাক পরিয়ে তিনি আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন। সমবয়সী অন্যান্য মেয়েদের পরনে ছিল সিল্কের পোশাক। তাদের পোশাকের দিকে তাকিয়ে আমার মন গর্বে ভরে উঠল এই ভেবে যে, আচার্যদেবের পোশাকের সঙ্গে স্বাজাত্য রয়েছে একমাত্র আমার পোশাকের। তাঁর পরনে ছিল খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবি। ১৯২৭ সালে মহাত্মা গান্ধী এলেন মাতা কস্তুরবাকে সঙ্গে নিয়ে। আমার হাত দিয়ে বাবা পাঠিয়ে দিলেন টাকা কস্তুরবা'র হাতে। সেদিন বুঝতে পারিনি, কিন্তু আজ বুঝতে পারি, বাবাই আমাকে হাত ধরে দেশজননীর সেবায় ধীরে ধীরে এগিয়ে দিচ্ছিলেন।

এমনি ক'রে এল ১৯২৮ সাল। তখন আমরা কুমিল্লা ফৈজুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী। সেদিন আমার পড়ার

টেবিলের সামনে বই নিয়ে বসেছি। জানালা দিয়ে দেখি, প্রকাণ্ড শোভাযাত্রা চলেছে। জনগণের সমবেতকণ্ঠের উদাত্ত ধ্বনি 'Go back Simon', 'ফিরে যাও সাইমন' গগন বিদীর্ণ করছে। তখনও ভাল বুঝিনি, কেন এই শোভাযাত্রা, কী তাৎপর্য এই ধ্বনির। কিন্তু সেই বহুমানুষের যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে কেন জানি মনে হয়েছিল, এই যে এত ছেলেমেয়ে এগিয়ে চলেছে দৃঢ় পদক্ষেপে, উচ্চকণ্ঠে তাদের দাবি জানিয়ে, আমিও কি তাদের মত বেরিয়ে পড়তে পারিনে এই ঘরের বেড়ার গণ্ডিটা ছাড়িয়ে?_ বুকের মধ্যে অভূতপূর্ব এক আলোড়ন অনুভব করেছিলাম। বিদেশীদের হাত থেকে দেশের শাসন-ব্যবস্থা দেশের লোকেদের হাতে না এলে ঘুচবে না জনসাধারণের দুঃখ, এই কথা তখন সবেমাত্র বুঝতে আরম্ভ করেছি। কিছুদিন আগেই আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষের টেবিল থেকে সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা' বইখানি নিয়ে রাত জেগে পড়েছিলাম। যারা এই ঐশ্বর্যশালিনী ভারতভূমির সমস্ত ঐশ্বর্য অপহরণ ক'রে এই দেশকে শ্মশানে পরিণত করেছে তাদের প্রতি বিদ্বেষে ও ঘৃণায় মন পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ইংরেজগুলোকে এক একজন ডাকাত ও ডাকাতের সর্দার ব'লে মনে হয়েছিল। দেশের যে-সব নেতা এদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করবার চেষ্টা করছেন—যাঁদের প্রচলিত আখ্যা ছিল 'স্বদেশী'— তাঁদের প্রতি একটা পূজার ভাব মনে জাগল। কেবলই মনে হত, এঁরাই আমার আপনার জন, এঁদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কাজের ভার নেওয়াই আমার জীবনের ব্রত।

১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ল কলকাতায়। তার সচিত্র বিবরণ মুদ্রিত হ'ল সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। সুভাষচন্দ্রের অধিনায়কত্বে সামরিক পোশাকে স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর কুচ-কাওয়াজের ছবি, ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে জওহরলালের বিরাট বিক্ষুব্ধ শ্রমিক-জনতার সামনে গিয়ে তাদের শান্ত করা, সভাপতি মতিলাল নেহেরু ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি যতীন্দ্রমোহন

সেনগুপ্তের বক্তৃতা করার সময়কার ছবি বারবার দেখি আর মনের মধ্যে চলতে থাকে অবর্ণনীয় আবেগের দোলা। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন আর পূর্ণ স্বাধীনতাব মধ্যে কী পার্থক্য, তা তখনও বুঝিনি ; কিন্তু শুধু এইটুকু বুঝলাম, এই সব নেতাদের এবং তাঁদের অগণিত সহকর্মীদের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা ও দুঃখবরণের মূলে রয়েছে ইংরেজ শাসকদের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করার দুর্জয় আকাঙ্ক্ষা। এমনি ক'রে স্বদেশানুরাগ ও দেশের জন্যে আত্মত্যাগের অনুপ্রেরণা আমার মধ্যে সঞ্চারিত হতে লাগল। এই নবলব্ধ অনুভূতি গতানুগতিক জীবনযাপনেব অভ্যস্ত পথ থেকে আমাকে ক্রমশ সবিয়ে নিয়ে যেতে লাগল এবং দেশেব জন্যে কিছু একটা কবাব আবেগ আমাকে আকুল করে তুলল।

আমার দাদা তখন ম্যাট্রিক পাশ কবে কলেজে ভর্তি হয়েছেন। তাঁর টেবিলে নিত্যনতুন বই দেখা যেত : 'দেশ-বিদেশেব বিপ্লবীদেব কাহিনী', 'সাককো ভেঞ্জেটি', 'ডি ভ্যালেবা', 'আন্দামানে দশ বৎসব', 'বাসপুটিন', 'বিপ্লবপথে বাশিয়াব রূপান্তব', ডাক্তার ভূপেন দত্তেব 'অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস'—এমনি অনেক বই। সে সব বই নিয়ে আমি পড়তাম। নিজেকে কল্পনা করতাম কখনও ঝাঁসিব বানী লক্ষ্মীবাঈয়েব ভূমিকায়, কখনও বা জোয়ান অব আর্কের, কখনও বাশিয়ার বিপ্লবী নারী 'ভেবা ফিগ্‌নার'-এর। নিজের ভাবীকালেব কর্মধারা সম্বন্ধে তখনও কোন সুস্পষ্ট ধারণা আমার ছিল না। কিন্তু দেশেব জন্যে আত্মত্যাগের একটি গভীব আবেগ ছিল মনের মধ্যে। পুরোনো মাসিক 'বসুমতী'তে গোপীনাথ সাহার জীবন-কথা পড়েছিলাম। আদালতে তাঁর বীরোক্তি—"আমার রক্তের প্রতিবিন্দু যেন ভারতের ঘরে ঘরে স্বাধীনতার বীজ বপন করে"—এই কথা কয়টি অনুক্ষণ আবৃত্তি করতে থাকি। বুকের মাঝে কবিগুরুর মাভৈঃ বাণী শুনতে পাই—

ভয় নাই, ওরে ভয় নাই,
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

সে সময় 'অনুশীলন' আর 'যুগান্তর' এই দুটি বৈপ্লবিক দল ভারতবর্ষের মুক্তি অর্জনের জন্যে রক্তবিপ্লবেব আয়োজনে লিপ্ত। আমার সহপাঠিনী প্রফুল্ল ব্রহ্ম যুগান্তর দলেব সঙ্গে ছিল সংশ্লিষ্ট। তারই মাধ্যমে আমার সঙ্গে স্থাপিত হল এঁদেব যোগসূত্র। আমাকে পেয়ে দাদারা খুশি, কারণ আমার মন পূর্ব থেকেই প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল এমনিতর কাজেব জন্যে। মিথ্যা অজুহাতে মাব কাছ থেকে ছুটি নিয়ে দাদাদের সঙ্গে নিয়মিত সাক্ষাৎকাব হতে লাগল। ঋষি বঙ্কিমের 'দেবী চৌধুরাণী' বহন ক'রে নিয়ে এল নতুনতব ইঙ্গিত। গীতা হল সঙ্গী। গীতাকে শুধু কর্মানুষ্ঠান আর দেবপূজায় আবৃত্তি করাব মন্ত্র ব'লে নিইনি আমরা, গীতা ছিল আমাদের অগ্নিমন্ত্রেব দীক্ষাগ্রন্থ। বাড়ি থেকে টাকা-পয়সা যা পারি সংগ্রহ ক'বে নিয়ে গিয়ে দলের দাদাদের হাতে তুলে দিতাম। আর এর জন্যে আমাব দাদাই খেতেন বকুনি। কারণ মা কল্পনা করতেই পারতেন না যে, আমার পক্ষে এভাবে টাকা সরিয়ে নেওয়া সম্ভব। দলের অর্থের প্রয়োজন; মায়ের গয়নার বাক্স থেকে একখানি সোনার হার নিয়ে গেলাম। দিন পনের পর ধরা পড়ল যে হার হাবানো গেছে। মাব সন্দেহ হল দাদার ওপর। তাঁর লাঞ্ছনাব সীমা রইল না। তিনি নীরবে সব সহ্য করে গেলেন। বুঝেছিলেন, কে নিয়েছে ওটা, আব কেনই বা নিয়েছে। আমাদের দলের সঙ্গে তাঁর ছিল না প্রত্যক্ষ যোগ। কিন্তু তবু আমার প্রতি তাঁর ছিল একটা বিশেষ প্রশ্রয়ের ভাব। সব কাজে আমি পেতাম তাঁর উৎসাহ আর প্রেরণা। কনিষ্ঠ সহোদর অমরপ্রসাদের মারফৎ দলের দাদাদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল। তাঁদের কাছ থেকে নির্দেশ

সে বহন ক'রে আনতো, আর নিয়ে যেতো চিঠিপত্র তাঁদের কাছে। ছোট্ট একটুখানি ছেলে, কিন্তু দিদির কাজে তার ছিল না কোন শৈথিল্য, কোন সংকোচ।

১৯৩০ সাল। লাহোর কংগ্রেসে জওহরলালের সভাপতিত্বে ঘোষিত হয়েছিল, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন নয়, পূর্ণ স্বাধীনতাই কংগ্রেসের লক্ষ্য। পঁচিশে জানুয়ারি বড়লাট আরুইন পরিষদে ঘোষণা করলেন, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারদানের প্রশ্নই ওঠে না। ভারতবর্ষ তার প্রত্যুত্তর জানাল পরের দিন ছাব্বিশে জানুয়ারি 'স্বাধীনতা-দিবস' উদ্‌যাপন ক'রে। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হলেন মহাসত্যাগ্রহী মহাত্মা গান্ধী। শুরু হল আইন-অমান্য আন্দোলন। ১২ই মার্চ উনআশী জন আশ্রমিককে নিয়ে গান্ধীজী সবরমতী থেকে পদব্রজে যাত্রা করলেন দুশো মাইল দূরে ডাণ্ডিতে লবণ আইন ভঙ্গের জন্যে। এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহ 'জাতীয় সপ্তাহ'। বাংলার মহিষ-বাথান হল এই অভিনব আন্দোলনের পুণ্যকেন্দ্র। গান্ধীজী শিষ্যদের নিয়ে ডাণ্ডিতে আইন অমান্য ক'রে অগ্রসর হলেন ধরশনার লবণের গোলা অধিকার করতে। শুরু হল গ্রেপ্তার আর নির্যাতনের পালা। কংগ্রেস আইন অমান্যের ক্ষেত্র ব্যাপকতর ক'রে তুলল। সরকারও দমননীতিকে কঠোরতর করল। কমপক্ষেও একডজন অর্ডিন্যান্স জারি হল। সংবাদপত্রের কণ্ঠ হল রুদ্ধ। সত্যাগ্রহের সংবাদ প্রকাশ হল নিষিদ্ধ। সভাসমিতি বে-আইনি ঘোষিত হল। পুলিশী জুলুম, লাঠিচালনা, এমন কি গুলিবর্ষণও চলল বহু জায়গায়। দণ্ডিত সত্যাগ্রহীর সংখ্যা হল লক্ষাধিক।

ভারতের শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে অপূর্ব উন্মাদনা। কুমিল্লা শহরও বেসামাল। আমরাও মিছিলে যোগ দিই, তকলি কাটি, জনসভায় গান করি, সর্বজনসমক্ষে বিলিতি বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব করি।

ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা নিয়ে আমরা থাকি মিছিলের পুরোভাগে। কিন্তু পুলিশ যখন এগিয়ে আসে ডাণ্ডা নিয়ে, ছেলের দল ছুটে আসে তখন সামনে, দাঁড়ায় আমাদের আড়াল ক'রে, পুলিশের বেপরোয়া লাঠিবৃষ্টি দেহ পেতে গ্রহণ করে অকাতরে। ছেলেদের কারও ভাঙ্গে মাথা, কারও ভাঙ্গে হাত। স্বেচ্ছাসেবকেরা তাদের ষ্ট্রেচারে ক'রে তুলে নিয়ে যায় কংগ্রেস-শিবিরে। আমরা লেগে যাই তাদের পরিচর্যার কাজে। মায়ের কাছ থেকে বাধা আসে না এসব কাজে। ঘরকন্নার কাজ ফেলে তিনি নিজেও ছুটে আসেন কংগ্রেস-শিবিরে। স্বেচ্ছায় তুলে নেন ছেলেদের সেবার ভার। সেবাধর্ম ছিল তাঁর রক্তে। স্বামী বিবেকানন্দের ভাগিনেয়ী হিসাবে এ যেন উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। স্বেচ্ছাসেবকদের রক্তাক্ত দেহের দিকে তাকিয়ে মন আমার বিদ্রোহ ক'রে ওঠে। ছুটে গিয়ে দলের দাদাদের কাছে প্রশ্ন করি, 'এমনি করে মার খাওয়ার কী সার্থকতা আছে? তার থেকে কি মেরে মরাই ভাল নয়? ওরা আঘাত করবে, আর আমরা ফিরিয়ে দেব না সে আঘাত?' পিঠ চাপড়ে বললেন দাদারা, এই তো চাই। পরের দিন মিছিলে নতুন ধ্বনি উচ্চারিত হয় আমাদের কণ্ঠে—"ভারতকে স্বাধীন করতে হবে। কী চাই?—স্বাধীনতা। দেব কী? রক্ত। আমরা সব মায়ের ভক্ত।"

সত্যিকথা বলতে গেলে, গান্ধীজীর আহ্বানে ভারতের অহিংস গণ-অন্দোলনে সাড়া দিতে বাংলার বিপ্লবী তরুণ-তরুণীরা কোনদিনই পশ্চাৎপদ হয় নি। কিন্তু অহিংসার মন্ত্র সম্পর্কে তাদের মন সংশয়-মুক্তও কোনদিনই ছিল না। গান্ধীজীর কাছে যা ছিল বীরের ধর্ম, পরাধীন ভারতের অসহায় পঙ্গু জনজীবনে তার বীরত্ব-মহিমার সন্ধান করা তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। তাই মহাদম্ভী প্রতিপক্ষের পাশব-শক্তির কাছে প'ড়ে প'ড়ে মার খাওয়ার প্রতিবাদ বুকের মাঝে মুখর হয়ে উঠত—

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে।

কে জানত, জীবনে সে আদেশ কবে কি ভাবে আসবে? কিন্তু তার জন্যে প্রস্তুতির অন্ত ছিল না। সামরিক কায়দায় কুচকাওয়াজ, লাঠিখেলা, ছুরিখেলা। পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে রিভলভারের গুলি ছোড়া।

প্রস্তুতি-পর্ব সমাপ্ত! এবার আদেশের জন্যে উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষা। এমনি প্রতীক্ষার দিনে এল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের চাঞ্চল্যকর শুভসংবাদ। ধন্য চট্টগ্রাম! সূর্য সেন, লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং আর তাঁদের সহকর্মী বীরবৃন্দের কাহিনী নতুন যুগের রূপকথার আকারে ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে। জালালাবাদের পাহাড়ে মেশিনগানের গুলিতে উৎসর্গীকৃত তরুণ কিশোরদের আত্মদানে অগ্নিযুগের সাধনা নতুন প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। কালার পোলে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে রজত সেন ও তার সহযাত্রী বিপ্লবী চতুষ্টয়ের সম্মুখ সংগ্রামের অনুপ্রাণনা তড়িৎশিখার মতোই পরিব্যাপ্ত হ'ল সমগ্র দেশে। হানো, আঘাত হানো, আঘাতের পর আঘাতে সাম্রাজ্যবাদী শাসনযন্ত্রের ইস্পাতকা-ঠামোকে আলগা ক'রে দাও। বিকল ক'রে দাও তাকে। নবজীবনের নতুন সূর্যকে বন্দনা জানাও—

প্রভাত সূর্য, এসেছ রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে।
অরুণ বহ্নি জ্বালাও চিত্ত মাঝে—
মৃত্যুর হউক লয়।
তোমারি হউক জয়॥

লক্ষ্যভেদ

১৯৩১ সাল। ডাণ্ডি-অভিযান থেকে আরম্ভ ক'রে একবৎসর কাল ধ'রে প্রবল জাতীয় আন্দোলন পর্যবসিত হল গান্ধী-আরুইন চুক্তিতে। দেশের অগণিত নরনারী গান্ধীজীর আহ্বানে সর্বস্ব পণ ক'রে মুক্তি-সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল, তাদের সাধনা কি সফল হল? যে শাসন-ব্যবস্থাকে গান্ধীজী নিজে শয়তানী-শাসন ব'লে অভিহিত করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত তারই সঙ্গে আপোষ-রফা করতে গান্ধীজী স্বীকৃত হলেন—চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়া সত্ত্বেও দমন-নীতি প্রত্যাহৃত হল না, ভগৎসিং ও তাঁর সহকর্মী দুজনের ফাঁসি রদ হল না;—অত্যাচার, নিপীড়নের অবসান ঘটল না। প্রশ্ন, সংশয়, হতাশা ও ক্ষোভ আলোড়িত করল কর্মীদের চিত্ত। এমনি পরিস্থিতিতে গান্ধীজী জাতীয় দাবির সমর্থনে দ্বিতীয় গোলটেবিলের কূটচক্রে যোগদান করলেন। আবেদন-নিবেদনের ব্যর্থ-নীতি পরিহার ক'রে প্রত্যক্ষ সংগ্রামকেই বরণ ক'রে নিয়েছে কংগ্রেস, এই প্রত্যয় দেশকর্মীদের আত্মত্যাগে অনুপ্রেরণা জাগিয়েছিল। তারা একে জাতীয় পরাভব ব'লে মনে ক'রল। কংগ্রেসের সংগ্রাম-বিরতির নির্দেশ বিপ্লববাদীদের কর্মধারার গতিরোধ করতে পারল না। বাংলা দেশের দিকে দিকে বিপ্লবীশক্তির ক্রিয়া প্রকাশ পেতে লাগল নানাভাবে। চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এবং অন্যান্য সুপরিকল্পিত বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টার দোলা ছিল যুববাঙলার রক্তে। প্রতিনিধি-স্থানীয় ইংরেজশাসকের হত্যার দ্বারা ইংরেজশাসন ধ্বংস করার সুদৃঢ় সংকল্প তাদের। সুনীতি ও আমি কুমিল্লার জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ষ্টিফেন্সকে হত্যা ক'রে ইংরেজশাসনের বিরুদ্ধে দেশের বিপ্লবীশক্তির অভিযানকেই রূপায়িত করলাম। ১৪ই ডিসেম্বর আমরা লিখলাম বাঙলার রক্তবিপ্লব ইতিহাসের একটি নতুন পৃষ্ঠা।

জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের সরকারি-বাসস্থান। সকাল প্রায় দশটা। সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে আমরা প্রবেশ করলাম সুবিস্তীর্ণ হলঘরে। সাহেব যখন এসে দাঁড়ালেন আমাদের সামনে, তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন এস্. ডি. ও. নেপাল সেন। মুহূর্তের মধ্যে গর্জে উঠল আমাদের দুজনের হাতের অগ্নি-নালিকা। আর্ত-চীৎকার ক'রে গুলিবিদ্ধ ষ্টিফেন্স ছুটলেন কক্ষান্তরে। নিমেষে উধাও হলেন নেপাল সেন। একজন আরদালি ছুটে এল আমাদের ধরবার জন্যে। তাকেও লক্ষ্য ক'রে আমি ছুঁড়লাম তৃতীয় গুলি। কিন্তু অদ্ভুত সাহস ও কর্তব্যনিষ্ঠা এই আরদালির। গুলিবিদ্ধ হাতেই সে কেড়ে নিল আমার হাত থেকে রিভলবার। তারপর চার-পাঁচজন আরদালি এসে আমাকে টেনে নিয়ে গেল পাশের দালানে। সুনীতিকে এর আগেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেখানে। দলবদ্ধ হয়ে আরদালির দল নির্মমভাবে প্রহার করতে লাগল আমাদের দুজনকে। পাশেই পুলিশ লাইনে তখন পাগলা ঘন্টি বেজে উঠেছে। পুলিশ এসে আমাদের দুজনের হাত দুটো পেছন করে বাঁধল। অবিশ্রান্ত চলেছে কিল, চড়, লাথি। কিন্তু নির্বিকার তখন আমরা। সফলতার আনন্দে দৈহিক পীড়নের অনুভূতি লোপ পেয়ে গেছে যেন। বললুম তাদের, "বাঁধন খুলে দাও আমাদের। পালাব না আমরা। কাজ আমাদের শেষ হয়ে গেছে।" জবাব দিল ওরা যে ভাষায় সে ভাষা প্রকাশের নয়। কিছুক্ষণ পরে ডি. আই. বি. ইন্সপেক্টার কালীমোহন কুশারী উন্মাদের মত ছুটতে ছুটতে এসে পৌছলেন সেখানে। আমাকে দেখে বিস্ময়ের আতিশয্যে চীৎকার ক'রে উঠলেন, "একি মা শান্তি, তুমি!" জবাব দিলাম, "হাঁ, জ্যাঠামশাই।" তাঁর সঙ্গে আগে থেকেই ছিল পরিচয়। বহিরাগত

হলেও কুমিল্লা শহরে ছিল আমার পিতার অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠা। ফলে পরিচিতের সংখ্যা ছিল আমাদের অগণিত। ইন্সপেক্টারের আদেশে খুলে দেওয়া হল আমাদের হাতের বাঁধন। আমাকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন তিনি। আমার কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায়ের সবরকম চেষ্টা যখন ব্যর্থ হল তখন আবার আমাদের দু'জনকে এক জায়গায় নিয়ে এল। আরও শক্ত ক'রে বাঁধল আমাদের হাত। দাঁড় করিয়ে রাখল আমাদের প্রহরী-ব্যূহের মধ্যে। সুযোগ পেয়ে পরিচিত এক পুলিশ কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মরেছে তো?'

পাশ কাটিয়ে চ'লে যেতে যেতেই বললেন তিনি, "তৎক্ষণাৎ।"

বেলা ১টা। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের আবাসগৃহ থেকে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল কুমিল্লা জেলে। এরই মধ্যে সংবাদ বিস্তৃতি লাভ করেছে সমগ্র শহরে। যে রাস্তা দিয়ে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল, তার দু'ধারে দেখা গেল অজস্র জনসমাগম। সেই জনতাকে উদ্দেশ্য ক'রে দু'জনে চীৎকার ক'রে উঠলাম 'বন্দেমাতরম্'।

জেলে সরকারি-কর্মচারীদের আগমন ও প্রশ্নের বিরাম নেই। শেষ পর্যন্ত তাদের হার মানতে হল আমাদের কাছে। কিছুতেই কিছু প্রকাশ করব না আমরা। পরদিন আমাদের মধ্যে এসে পৌঁছলেন ইন্দুমতী সিংহ ও প্রফুল্ল ব্রহ্ম। এদিকে, সুতীব্র মানসিক উন্মাদনার মধ্যে যে কঠোর দৈহিক নির্যাতনকে আমরা উপেক্ষা করেছিলাম এতদিন, প্রাকৃতিক অলঙ্ঘনীয় নিয়মে আমাদের দেহের ওপর তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল অল্পদিনের মধ্যে। সে সময় ইন্দুদির আর প্রফুল্লর পরিচর্যাই ছিল আমাদের একমাত্র আশ্রয়।

বিচার প্রহসন

২৭শে ডিসেম্বর আমাদের নিয়ে আসা হল কলকাতায়। ইতিমধ্যে আমাদের বিচারের জন্যে গঠিত হয়ে গেছে বিশেষ আদালত। আসার সময় ইন্দুদি ও প্রফুল্লর কাছে যখন বিদায় নিই তখন ইন্দুদি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, হয়ত কলকাতায় নিয়ে গিয়ে পুলিশ নির্যাতনের মাত্রা দেবে বাড়িয়ে। মনে মনে আমরা প্রস্তুত হলাম কঠিনতর পীড়নের জন্যে। রাজনীতিক বন্দীদের কাছ থেকে গোপন তথ্য আদায় করার জন্যে পুলিশ যে অত্যাচার ও উৎপীড়নের আশ্রয় নিত তার মধ্যে আঙুলের গোড়ায় পিন ফুটিয়ে দেওয়া, নগ্নদেহে বরফের ওপর শুইয়ে রাখা, বৈদ্যুতিক 'শক' (Shock) দেওয়া প্রভৃতির কথা আমরা বহুবার শুনেছি। চাঁদপুর থেকে গোয়ালন্দের পথে স্টিমারে ব'সে আমরা পরস্পরের আঙুলের মধ্যে সেফ্‌টি-পিন সজোরে ফুটিয়ে দিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখলাম, আমরা সে যন্ত্রণা সহ্য করতে পারি কি না। দেখা গেল, এও সহ্য করা যায়। কিন্তু বরফে শুইয়ে রাখা ও বৈদ্যুতিক শক্?—এগুলি পরীক্ষা করা যায় কী ক'রে? দু'জনে সঙ্কল্প করলাম, যত অত্যাচারই করুক, কিছুই প্রকাশ করব না আমরা।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন আমার ছোটমামা শ্রীশিশিরকুমার মিত্র। প্রথমেই প্রশ্ন করলেন, 'কোন অত্যাচার করেনি তো?' হাসিমুখে, বললাম 'কিচ্ছু না, বেশ সুখেই আছি আমরা।' তাঁকে ব'লে দিলাম, আমাদের দু'জনের জন্যে খদ্দরের লালপাড় শাড়ি ও লাল ব্লাউস এনে দিতে হবে, প'রে কোর্টে যাব। শ্রীযুত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী প্রমুখ আইন-অমান্য-আন্দোলনের রাজনীতিক বন্দীরা তখন ছিলেন আলিপুর জেলে। আমাদের খাওয়া-দাওয়ার প্রতি ছিল তাঁদের সস্নেহ দৃষ্টি। নিত্যনতুন খাবার আসত। ভিন্ন

পথের পথিক হলেও দেশের মুক্তি-সংগ্রামের সৈনিক হিসাবে এঁরা ছিলেন আমাদের আত্মার আত্মীয়।

আমাদের পক্ষ থেকে মামলা চালাবার ভার নিলেন তদানীন্তন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যারিস্টার বি, সি, চ্যাটার্জি। প্রথম দিনে আমাদের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে গম্ভীর হয়ে বললেন, 'স্টিফেন্স তো তার জাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে। সে যাক, তোমাদের কিন্তু আমার একটি কথা রাখতেই হবে।'

বুঝলাম কী সে কথা। বললাম, 'মিথ্যেকথা' আমরা বলব না। ফাঁসিই আমাদের কাম্য। ফাঁসির রশি গলায় প'রে আমবা যেন গোপীনাথের মত বলতে পারি, 'আমার রক্তের প্রতিবিন্দু যেন ভারতের ঘরে ঘরে স্বাধীনতার বীজ বপন করে।'

সেদিন ফিরে গেলেন তিনি ব্যর্থ হ'য়ে। আবার এলেন পরের দিন। অনেক করে বোঝালেন আবার। শেষ পর্যন্ত পিতৃস্নেহের প্রবল প্লাবনে কিশোর-মনের প্রতিজ্ঞা ভেসে গেল। রাজি হলাম আমরা। ভারি খুশী হলেন তিনি। যাবার সময় ব'লে গেলেন, ১৮ই জানুয়ারি আরম্ভ হবে আমাদের মামলা। এও জানিয়ে গেলেন, হাইকোর্টের সমস্ত ব্যারিস্টার অনুমতি চেয়ে নিয়েছেন আমাদের বিচার দেখার জন্যে।

ইতিমধ্যে মামা দিয়ে গেছেন খদ্দরের শাড়ি ও লাল ব্লাউস। তাই প'রে খেয়ে-দেয়ে তৈরি আমরা সাড়ে ন'টায়। সার্জেন্ট-ভর্তি জেলের গাড়িতে ক'রে এসে পৌঁছুলাম কলকাতা হাইকোর্টের সামনে। গাড়ি থেকে নেমেই দেখি, কোর্টের দরজা পর্যন্ত দু'ধারে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী দাঁড়িয়ে গেল সারি দিয়ে, আর তাদের মধ্য দিয়ে আমাদের নিয়ে গিয়ে পোরা হল একটি বন্ধ ঘরে। ঠিক দশটার সময় দু'জন সার্জেন্ট এসে সর্পিল এক লোহার সিঁড়ি দিয়ে নিয়ে গেল আমাদের ওপরে।

আমরা সেখানে পৌঁছতেই ব্যারিস্টার চ্যাটার্জি এসে দেখা করলেন আমাদের সঙ্গে। জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাদের বসতে চেয়ার দেবে না?'

বললেন, 'জজকে ব'লে আমি ব্যবস্থা করছি।'

সমগ্র বিচারগৃহ ব্যারিস্টার, এডভোকেট ও দর্শকে পরিপূর্ণ। সকলেই চুপ। জজেরা এসে ঢুকতেই সবাই উঠে দাঁড়িয়ে তাঁদের প্রতি সম্মান দেখালেন। তাঁরা তাঁদের আসনে বসবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ব'লে উঠলাম, 'আমাদের বসতে চেয়ার দেওয়া হোক।'

সেই গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে স্তব্ধ বিচারগৃহ দু'টি বিদ্রোহী-কণ্ঠের প্রতিধ্বনিতে গমগম করে উঠল। সবার বিস্মিত দৃষ্টি নিবদ্ধ হল আমাদের ওপর। অনুরোধ আমাদের রক্ষিত হল। তৎক্ষণাৎ আমাদের বসার আসন দিয়ে গেল।

মধ্যাহ্ন-বিরতির সময় আবার আমাদের সেই বন্ধ ঘরে নিয়ে আসা হল। সেখান থেকে পুনরায় যখন কাঠগড়ায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন একজন সার্জেন্ট এসে বললে,'Put off your shoes please'.

জিজ্ঞেস করলাম, 'হঠাৎ এই আদেশ কেন?'

জবাব পেলাম, 'সঙ্গে জুতো থাকলে তোমরা ছুড়ে মারতে পার জজ বা সাক্ষীদের দিকে।'

জজেরা যখন ঘরে ঢুকলেন তখনই সবাই উঠে দাঁড়ালেন, আমরা কিন্তু বসে রইলাম। পরদিন এসে দেখি, আমাদের কাঠগড়ায় আর চেয়ার দেওয়া হয়নি। বোঝা গেল, জজেরা ঘরে ঢোকার সময় আমরা উঠে দাঁড়াইনি, এ তারই শাস্তি। কিন্তু আমাদের জব্দ করবে কে? সেদিন যখন জজেরা ঢুকলেন ঘরে, আমরা তাঁদের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ালাম। সমস্ত ব্যারিস্টার-মহল খুশী হয়ে উঠেছিলেন। আমাদের এই পেছন-ফিরে দাঁড়ানোর মধ্যেও ওঁরা আমাদের নির্ভীকতা ও বিপ্লবী মনোভাবের পরিচয় পেয়েছিলেন। একথা পরে আমরা শুনেছিলাম ব্যারিস্টার চ্যাটার্জির মুখে। আমাদের এই নতুন ভঙ্গীতে প্রতিবাদ জানানো বিফল হ'ল না। এরপর থেকে নিয়মিত-

ভাবে চেয়ারে আসতে লাগল আমাদের বসবার জন্যে। আমার ছোটমামা ও সুনীতির দাদা (শ্রীসুকুমার চৌধুরী) বিচারগৃহে উপস্থিত থাকতেন রোজই। কাঠগড়ায় চেয়ারে ব'সে ব'সে আমরা মজা করার নিত্যনতুন ফন্দি বার করতাম। সরকারপক্ষের সাক্ষীদের মিথ্যা জবানবন্দী আমাদের মধ্যে কৌতুকের সঞ্চার করত। কাঠগড়া থেকে তাদের যেভাবে বিদ্রূপ করতাম তাতে মাঝে মাঝে সমগ্র আদালত-গৃহে হাসির ফোয়ারা ছুটে যেত।

যেদিন এস্. ডি. ও. নেপাল সেন এসে মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছিল, সেদিন আমরা কাঠগড়া থেকে চীৎকার করে বলি, 'মিথ্যাবাদী' (**great liar**)!

সরকার পক্ষের কৌঁসুলী স্যার নৃপেন্দ্রনাথ আর সহ্য করতে পারলেন না। জজেদের কাছে আবেদন জানালেন, বিচারের সময় যেন আমাদের উপস্থিত থাকতে দেওয়া না হয়। আমরা তখনও চীৎকার ক'রে চলেছি। ব্যাবিস্টার চ্যাটার্জিকে শেষ পর্যন্ত আসতে হল আমাদের কাছে।

আমাদের স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা সুহাসিনী বিশ্বাস যেদিন সাক্ষ্য দিতে এলেন সেদিন তাঁকে দেখে আমাদের মন আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠলো। কী যে ভালবাসতেন তিনি আমাদের বার বার ক'রে সেই কথাই মনে হতে লাগল। তিনি আমাদের দিকে একবার শান্ত-বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন, তারপরে কৌঁসুলীদের প্রশ্নের জবাবে যা বললেন—তাতে না ছিল মিথ্যার আভাস, না ছিল কোন অতিরঞ্জনের প্রয়াস। কিন্তু সত্যভাষিণী সুহাসিনী বিশ্বাস যে একা! 'প্রভুর পদে সোহাগ-মদে দোদুল কলেবর'—নেপাল সেনেরাই সংখ্যায় অগুণতি!

এইভাবে তৈরি-করা ও সাজানো সাক্ষীদের সাক্ষ্য দেওয়ার পর্ব শেষ হল। তারপরে আরম্ভ হল দু'পক্ষের কৌঁসুলীদের সওয়াল। এখনও মনে পড়ছে, ব্যারিস্টার বি. সি. চ্যাটার্জীর সেই তেজোদৃপ্ত বক্তৃতা। আমাদের ধরাপড়ার পরে আমাদের সমস্ত কাপড়-জামা ছাড়িয়ে নিয়ে

প'রতে দিয়েছিল একখানি ক'রে কালোপাড়ের শাড়ি। আমরা তাতে আপত্তি ক'রে বলেছিলেম, শেমিজ না দিলে প'রব না আমরা শাড়ি।

পুলিস জবাব দিয়েছিল, 'তোমরা না পরলে আমরা জোর ক'রে পরিয়ে দেব।'

বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ব্যারিস্টার বি. সি. চ্যাটার্জি এই ঘটনার কথা যখন উত্থাপন করেন তখন সরকারপক্ষের কৌঁসুলী স্যার নৃপেন্দ্রনাথ ব'লে উঠলেন 'এ রকম পোশাক-পরা অনেক মেয়েকেই কলকাতার গঙ্গার ঘাটে দেখা যায়।'

আহত শার্দুলের মত গর্জে উঠলেন ব্যারিস্টার চ্যাটার্জি, 'এদের তুমি তুলনা কর তাদের সঙ্গে?'

বিদেশী প্রভুদের কাছে বিক্রীত-বিবেক বিমূঢ়তার উদ্দেশে আত্মসম্মানে উদ্বুদ্ধ মুক্তিকাম ভারতের সে ভৎর্সনার সুর চিরদিন কর্ণকুহরে ধ্বনিত হ'তে থাকবে!

বিচার-প্রহসনের উপর যবনিকাপাত হল। রায়দান স্থগিত রইল কিছুকালের জন্যে। মনে হল, ফাঁসিই হবে আমাদের। শঙ্কা-ভাবনা-রহিত মন। আনন্দে গান গেয়ে গেয়ে সময় কাটাই। জেলগেটে আত্মীয়দের জমা-দেওয়া টাকা থেকে নিত্যনতুন খাবার কিনে খাই।

সেদিন ২৭শে জানুয়ারি, সকাল ৮টা। কারাগারের অধ্যক্ষ মেজর পাট্‌নি এসে বললেন, 'তোমরা তৈরি হয়ে নাও, এক্ষুণি আদালতে যেতে হবে।'

আদালতে গিয়ে দেখি খুব কড়া পাহারা চারদিকে। সেদিন আর নীচের ঘরে বসিয়ে রাখল না, গাড়ি থেকে নামিয়েই সোজা নিয়ে গেল ওপরে। ব্যারিস্টার-এড্‌ভোকেটরা সব দল বেঁধে ব'সে

ভাবে চেয়ার আসতে লাগল আমাদের বসবার জন্যে। আমার ছোটমামা ও সুনীতির দাদা (শ্রীশুকুমার চৌধুরী) বিচারগৃহে উপস্থিত থাকতেন রোজই। কাঠগড়ায় চেয়ারে ব'সে ব'সে আমরা মজা করার নিত্যনতুন ফন্দি বার করতাম। সরকারপক্ষের সাক্ষীদের মিথ্যা জবানবন্দী আমাদের মধ্যে কৌতুকের সঞ্চার করত। কাঠগড়া থেকে তাদের যেভাবে বিদ্রূপ করতাম তাতে মাঝে মাঝে সমগ্র আদালত-গৃহে হাসির ফোয়ারা ছুটে যেত।

যেদিন এস্. ডি. ও. নেপাল সেন এসে মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছিল, সেদিন আমরা কাঠগড়া থেকে চীৎকার করে বলি, 'মিথ্যাবাদী' (great liar)!

সরকার পক্ষের কৌঁসুলী স্যার নৃপেন্দ্রনাথ আর সহ্য করতে পারলেন না। জজেদের কাছে আবেদন জানালেন, বিচারের সময় যেন আমাদের উপস্থিত থাকতে দেওয়া না হয়। আমবা তখনও চীৎকার ক'রে চলেছি। ব্যারিস্টার চ্যাটার্জিকে শেষ পর্যন্ত আসতে হল আমাদের কাছে।

আমাদের স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা সুহাসিনী বিশ্বাস যেদিন সাক্ষ্য দিতে এলেন সেদিন তাঁকে দেখে আমাদের মন আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠলো। কী যে ভালবাসতেন তিনি আমাদের বার বার ক'রে সেই কথাই মনে হতে লাগল। তিনি আমাদের দিকে একবার শান্ত-বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন, তারপরে কৌঁসুলীদের প্রশ্নের জবাবে যা বললেন—তাতে না ছিল মিথ্যার আভাস, না ছিল কোন অতিরঞ্জনের প্রয়াস। কিন্তু সত্যভাষিণী সুহাসিনী বিশ্বাস যে একা! 'প্রভুর পদে সোহাগ-মদে দোদুল কলেবর'—নেপাল সেনেরাই সংখ্যায় অগুণতি!

এইভাবে তৈরি-করা ও সাজানো সাক্ষীদের সাক্ষ্য দেওয়ার পর্ব শেষ হল। তারপরে আরম্ভ হল দু'পক্ষের কৌঁসুলীদের সওয়াল। এখনও মনে পড়ছে, ব্যারিস্টার বি. সি. চ্যাটার্জীর সেই তেজোদৃপ্ত বক্তৃতা। আমাদের ধরাপড়ার পরে আমাদের সমস্ত কাপড়-জামা ছাড়িয়ে নিয়ে

প'রতে দিয়েছিল একখানি ক'রে কালোপাড়ের শাড়ি। আমরা তাতে আপত্তি ক'রে বলেছিলেম, শেমিজ না দিলে প'রব না আমরা শাড়ি।

পুলিস জবাব দিয়েছিল, 'তোমরা না পরলে আমরা জোর ক'রে পরিয়ে দেব।'

বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ব্যারিস্টার বি. সি. চ্যাটার্জি এই ঘটনার কথা যখন উত্থাপন করেন তখন সরকারপক্ষের কৌঁসুলী স্যার নৃপেন্দ্রনাথ ব'লে উঠলেন 'এ রকম পোশাক-পরা অনেক মেয়েকেই কলকাতার গঙ্গার ঘাটে দেখা যায়।'

আহত শার্দুলের মত গর্জে উঠলেন ব্যারিস্টাব চ্যাটার্জি, 'এদের তুমি তুলনা কর তাদের সঙ্গে?'

বিদেশী প্রভুদের কাছে বিক্রীত-বিবেক বিমূঢ়তার উদ্দেশে আত্মসম্মানে উদ্বুদ্ধ মুক্তিকাম ভারতের সে ভর্ৎসনার সুর চিরদিন কর্ণকুহরে ধ্বনিত হ'তে থাকবে!

বিচার-প্রহসনের উপর যবনিকাপাত হল। রায়দান স্থগিত রইল কিছুকালের জন্যে। মনে হল, ফাঁসিই হবে আমাদের। শঙ্কা-ভাবনা-রহিত মন। আনন্দে গান গেয়ে গেয়ে সময় কাটাই। জেলগেটে আত্মীয়দের জমা-দেওয়া টাকা থেকে নিত্যনতুন খাবার কিনে খাই।

সেদিন ২৭শে জানুয়ারি, সকাল ৮টা। কারাগারের অধ্যক্ষ মেজর পাট্নি এসে বললেন, 'তোমরা তৈরি হয়ে নাও, এক্ষুণি আদালতে যেতে হবে।'

আদালতে গিয়ে দেখি খুব কড়া পাহারা চারদিকে। সেদিন আর নীচের ঘরে বসিয়ে রাখল না, গাড়ি থেকে নামিয়েই সোজা নিয়ে গেল ওপরে। ব্যারিস্টার-এড্ভোকেটরা সব দল বেঁধে ব'সে

আছেন। জজেরা আসার একটুখানি আগে ব্যারিস্টার চ্যাটার্জি এসে আমাদের সঙ্গে দেখা ক'রে গেলেন। ঠিক সাড়ে ন'টায় এসে পৌছলেন জজেরা। রায় পড়তে তাঁদের প্রায় ঘণ্টা দেড়েক লাগল।

দণ্ডাদেশ ঘোষিত হল অবশেষে—"যাবজ্জীবন কারাবাস।"

জীবনের সেই পরম লগ্নের কথা ভাষায় ধরে রাখা সম্ভব নয়। জীবন-মৃত্যুব মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হৃদয়ের সে কি উন্মাদন-উত্তেজনা! হতাশা আর প্রত্যাশায়, প্রতীক্ষা আর উৎকণ্ঠায়, আবেগে আর উদ্দীপনায়, চিন্তা, অনুভূতি আর ইচ্ছা—মনের এই তিনটি বৃত্তির সমবেত উচ্ছ্বাস-প্রাবল্যে অনির্বচনীয় সেই চরম মুহূর্তের উপলব্ধি। দণ্ডাদেশ উচ্চারিত হবার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত অন্তর দেবতার গুঞ্জরণ কবির ভাষা খুঁজে ফিরছিল—

"আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগো রে সকল দেশ।"

ফাঁসির আদেশেরই প্রতীক্ষা করছিলাম, তাই যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ডাদেশে যেন হতাশ হলাম। চরম মুক্তির পূর্ব-মুহূর্তে এ যেন চিরজীবনের বন্ধনের ব্যবস্থা। অন্তরে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে আমরণ কারাগারের অন্ধকারে পুড়ে মরার অসহনীয় যন্ত্রণা।

পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা

প্রেসিডেন্সি জেলে

এবার জেলখানার গাড়ি চলল প্রেসিডেন্সি জেলের দিকে। সেখানেই আপাতত নির্দিষ্ট হয়েছে আমাদের আস্তানা। ইংরেজ রক্ষী এসে দু'টো ফুল উপহার দিয়ে জানাল তাদের অন্তরের স্তুতি। স্বাধীন দেশেব লোক। দেশের স্বাধীনতার জন্যে যে লড়াই তাব যথার্থ মূল্য বুঝতে তাব দেরি হল না এতটুকু। বাঙলাব দু'টি বিপ্লবী নাবীর প্রতি সেই শ্রদ্ধাঞ্জলি তাদের জাতীয় চবিত্রেব একটা উজ্জ্বল দিক খুলে ধরল আমাদের চোখেব সামনে।

প্রেসিডেন্সি জেলে আমরা প্রবেশ কবাব সঙ্গে সঙ্গে ওখানকাব বাজবন্দী-মহলে সাড়া পড়ে গেল। জেলেব ভেতব পা দিযে [illegible]মেই দেখা হযে গেল কুমিল্লাব বাজবন্দী যোগেশ চ্যাটার্জিব সঙ্গে। সালে তাঁব কাছে লাঠি ও ছোবাখেলা শিক্ষা করেছি। প্যারেডে লাঠি-ছোবা-খেলায় পারদর্শিতাব জন্যে কত প্রশংসা পেয়েছি তাঁব কাছ থেকে। যদিও বাজনৈতিকক্ষেত্রে আমি ছিলাম ভিন্ন দলে, অর্থাৎ যুগান্তব দলে, তথাপি আমার প্রতি তাঁব স্নেহ দিনেকের জন্যে ব্যাহত হয়নি। তাঁকে দেখে খুশীতে মন ভ'রে উঠল। স্মিতহাস্যে তিনি আমাদের অভিনন্দন জানালেন। সে সময তাঁব সঙ্গে ছিলেন অমূল্য মুখার্জি, মণীন্দ্র চৌধুবী, অতীন বায় ও শৈলেশ চ্যাটার্জি। 'জেনানা ফাটকে' প্রথমেই আমাদেব অভিনন্দন জানালেন কল্যাণী দাশ। স্নেহে ও মাধুর্যে কোমল প্রশান্ত মুখখানি দেখে মনে হল যেন কতদিনের আপনার। অপরিচয়েব ব্যবধান দূরীভূত হল একমুহূর্তেই।

লৌহকপাটঘেরা কারাগারের মধ্যে আমরা পেলাম একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয়। আদর ক'রে হাত ধ'রে নিয়ে গেলেন ওঁদের ঘরে। সেখানে পরিচয় হল শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দত্তর সঙ্গে। মাতৃসমা এই

মহিলাটিকে 'মাসীমা' সম্বোধন ক'রে আমরা অনায়াসে আপনার ক'রে নিলাম। তিনি আমাদের আঁকড়ে ধরলেন তাঁর স্নেহময় বক্ষে। কল্যাণীদি, অমিতাদি, সুলতাদি এঁরা ছোট্ট শিশুর মতই আমাদের বুকে তুলে নিলেন। গানে-গল্পে হাসিতে-হল্লায় প্রেসিডেন্সি জেলকে আমরা মাতিয়ে তুললাম।

কুমিল্লা ছিল জাতীয়-সংগীতের অনুশীলন-তীর্থ। অজয় ভট্টাচার্য গান রচনা করতেন বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে আর সে-গানে সুর দিতেন হিমাংশু দত্ত। আর সে-সব গান আমাদের শেখাতেন সুশীল মজুমদার, ননী মজুমদার, এঁরা। মনে পড়ছে, কুমিল্লার শরৎবন্দনা উৎসবের কথা। সারা বাংলা দেশ জুড়ে আয়োজন হয়েছে শরৎচন্দ্রের অমর-প্রতিভার উদ্দেশ্যে জাতির শ্রদ্ধা নিবেদনের। এই উৎসবে কে গান গাইবে, এই নিয়ে উঠল প্রশ্ন। অজয় ভট্টাচার্যের বিচারে আমারই ওপর পড়ল সে উৎসবে উদ্বোধন-সংগীত গাইবার ভার। সে-সব দিনের কথা এখনও মনে পড়ে এবং মনে পড়ে কী ভাবে জাতীয়-সংগীতের ভেতর দিয়ে আমাদের রক্তের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল জাতীয় মুক্তি-সাধনার উন্মাদনা। তখনকার দিনের শেখা এবং বহু জনসমাবেশে গাওয়া দু'টি গান—'জাগো হে সুপ্ত অগ্নিবীর' আর 'জয়তু পতাকা জয়' —প্রেসিডেন্সি জেলে প্রায় প্রতিদিনই গাইতে হত দিদিদের বিশেষ অনুরোধে। এই দু'টো গানই রচনা করেছিলেন অজয় ভট্টাচার্য—যখন গান্ধীজী জাতীয়-পতাকার মধ্যে লাল রং বাদ দিয়ে গৈরিক রং প্রবর্তন করলেন।

কল্যাণীদির কাছে অনেক গল্পই শুনতাম আমরা। বীণাদির গল্পও প্রথম তাঁর কাছেই শুনলাম। তিনি বললেন একদিন, 'জানিস্, আমার এক বোন আছে, তার নাম বীণা। তোদের মত কাজে তারও

খুব উৎসাহ। কখনও যদি তোদের সাথে দেখা হয় ভারি খুশী হবে সে।'

তখন কে জানত, দু'দিন যেতে না-যেতে এই বীণাদিই কারাবাসের হুকুমনামা নিয়ে এসে দাঁড়াবেন আমাদের সামনে!

প্রেসিডেন্সি জেলে আমাদের আর একটি বিস্ময় বিভা দাশগুপ্তা। দেহ ও অন্তরের অপরূপ ঐশ্বর্যদীপ্তি সর্ব অবয়বে। হাসিতে, কৌতুকে, গল্পে ভরিয়ে তুলত জেলের নিরানন্দ দিনগুলি। সুনীতির সঙ্গে ভারি ভাব হল বিভার। দু'জনের অন্তরাত্মা একান্তভাবে বরণ ক'রে নিল পরস্পরকে, কারণ তাদের দু'জনের প্রকৃতির মধ্যে ছিল একটা স্বাজাত্য, তাদের দু'জনের কণ্ঠে ছিল সংগীতের কলধারা। বন্য বিহঙ্গীর মত অফুরন্ত কলহাস্যে ভরিয়ে তুলত কারাগারের বৈচিত্র্যহীন দিনগুলি। ওদের কথাবার্তা, চলাফেরা, সবকিছুর মধ্যেই ছিল একটা অভিনবত্ব।

মনে পড়ে একদিনের ঘটনা। ভোরের আলো ফুটবার আগেই আমাদের ঘরের দরজা খোলা হত। ওর নাম 'লক্-আপ' খোলা। সেই আধো-অন্ধকারের মধ্যেই আমাদের চা-রুটি দিয়ে যেত। জেনানা-ফাটকের সদর দরজায় আমরা মগ হাতে দাঁড়িয়ে থাকতাম চা নেবার জন্যে। জমাদারনী মাঝখানে দাঁড়িয়ে তদারক করত পরিবেশনের। সেদিন ভোরে আমি ও অমিতাদি বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ শুনতে পেলাম, সুনীতি বিভাকে বলছে, 'জান বিভা, রুটির উপর মাখনগুলা এমনভাবে মাখায় এখানে যেন মনে হয় জিভ দিয়া রুটির উপর চাটান দিয়া দিছে।"

অমিতাদি ও আমি আর হাসি থামাতে পারিনে। সমস্ত জেলখানায় রাষ্ট্র হয়ে গেল সুনীতির এই উপমাটা। কিছুদিন ধরে সকলের মুখে মুখে ফিরতে লাগল কথাটি।

প্রেসিডেন্সি জেলে থাকবার সময় আমি আর সুনীতি দু'জনেই ছিলাম তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। জেলেও শ্রেণীবিভাগ। পারিবারিক, সামাজিক ও আর্থিক প্রতিপত্তির ওপর ভিত্তি ক'রে নিরূপণ করা হয় কয়েদীদের শ্রেণী। কিছুকাল পরে যদিও আমি দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছিলাম, সুনীতিকে তবু ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীতেই থাকতে হয়েছিল। দীর্ঘকালের আন্দোলনের ফলে রাজনৈতিক বন্দীদের এই কুৎসিত শ্রেণীবিভাগ ইংরেজ সরকার লোপ ক'রে দিতে বাধ্য হয় ১৯৩৮ সালে।

আমরা যখন প্রেসিডেন্সি জেলে, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলীও তখন সেখানে ছিলেন প্রথম শ্রেণীর বন্দী-হিসাবে। তাঁর বয়স ও স্বাভাবিক গাম্ভীর্য এমন একটা গণ্ডী রচনা ক'রে রেখেছিল যে আমরা তার ভেতর প্রবেশের পথ পেতাম না। বিশেষ ক'রে যখন জানতে পারলাম যে, সশস্ত্র বিপ্লববাদে যারা বিশ্বাসী তাদের তিনি পছন্দ করেন না, তখন তাঁকে পরিহার ক'রে চলাই স্থির করলাম আমরা। কল্যাণীদিও ছিলেন খাঁটি গান্ধীবাদিনী ; তবু আমাদের ওপর ছিল তাঁর অপরিসীম স্নেহ। গৌরব বোধ করতেন আমাদের কার্যকলাপ নিয়ে। দেশের স্বাধীনতার জন্যে যারা চরম আত্মোৎসর্গের পথ বেছে নিয়েছে, শুধু মতের বিভিন্নতার জন্যে তাদের উপেক্ষা করার মত সংকীর্ণ মনোভাব তাঁর ছিল না। তাই তিনি তাঁর সহকর্মী বন্ধুদের সবার সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলীর কাছে কোনদিন তিনি আমাদের নিয়ে যাননি। আমরা দূর থেকে দেখতাম তিনি তাঁর দু'-একজন সঙ্গী নিয়ে পদচারণা ক'রে বেড়াচ্ছেন জেলের বাগানে। দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দী-হিসাবে কল্যাণীদিরা যে-সব বিশেষ আহার্য ও পরিধেয় পেতেন তার অংশ তাঁরা আমাদেরও দিতেন।

এটা জ্যোতির্ময়ী দেবী পছন্দ করতেন না। অবশ্য এর মধ্যে তাঁর কোন স্বার্থপরতা বা ক্ষুদ্র মনোভাব ছিল না। তাঁর আপত্তি ছিল শুধু জেলের নিয়ম ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার বিরুদ্ধে। বিভার প্রতি তাঁর ছিল একটা প্রতিকূল মনোভাব এবং এটা জানত বলেই বিভা ও সুনীতি বিপ্লবী গান গেয়ে গেয়ে ঘুরে বেড়াত তাঁর আশেপাশে। একদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা সব খেতে বসেছি—বিভা জ্যোতির্ময়ী দেবী সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে এক বিশেষ বিশেষণে তাঁকে অভিহিত করল।

ঠিক সেই সময়ে তিনি যাচ্ছিলেন আমাদের পাশ দিয়ে। কথাটা গেল তাঁর কানে। যেতে যেতে গম্ভীরভাবে ব'লে গেলেন, 'বিভা, যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়।'

কল্যাণীদি সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ। ন্যায় ও নীতিনিষ্ঠা তাঁর অনন্য-সাধারণ। বিভাকে ভর্ৎসনা ক'রে বললেন, 'বিভা, গুরুজন সম্পর্কে তোমার এরকম মন্তব্য করা অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে!'

বিভার জীবনের অনেক কৌতুকজনক গল্পই আমরা শুনতাম তার কাছে। একটি গল্প মনে পড়ছে যাতে তার চরিত্রের একটা বিশেষ দিক পরিস্ফুট। বিভার বাড়ি ছিল যশোহরে। সেখানে রাজনৈতিক সম্মেলন হচ্ছে। সুভাষচন্দ্র গেছেন সভাপতিত্ব করতে। সভা-সমিতি, দলীয় আলোচনা প্রভৃতিতে অক্লান্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছে বিভা। সন্ধ্যাবেলা শ্রান্ত হয়ে যখন ফিরবেন তখন তাঁকে খেতে দেবার জন্যে ডাব সংগ্রহ করা হয়েছে। ডাবটি কেটে ঠিক ক'রে রাখা হয়েছে যেন তিনি হাত-মুখ ধুয়ে এসেই সেই ডাবের জল খেতে পারেন। গ্রামাঞ্চলে কাঁচের গেলাশের তেমন চল নেই। ডাবটাই মুখের উপর উপুড় ক'রে ধ'রে জল খাবেন, এই ছিল ব্যবস্থা। সুভাষচন্দ্রের সাময়িক অনুপস্থিতিতে বিভা ডাবের জলটুকু খেয়ে নিয়ে ডাবের মুখটা আবার ঠিক বন্ধ ক'রে রেখে দিয়েছে। সুভাষচন্দ্র এসে ডাবটা মুখে দিতেই দেখেন ডাবে জল নেই! সবাই অপ্রস্তুত।

সুভাষচন্দ্র ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন, বিভারই এ কাজ। বললেন, 'ডাক বিভাকে।'

বিভা এল, বল্‌লে, 'হাঁ, খেয়েছিই তো! আমার জন্যে চাইলে কেউ তো ভাব দেবে না, কিন্তু পরিশ্রম কি আপনার চেয়ে আমার কম হয়েছে?'

সুভাষচন্দ্র হেসে ফেল্‌লেন। ওর এমনি দুরন্তপনার পরিচয় জেলে আমরা প্রায়ই পেতাম।

তখনও পর্যন্ত আইন-অমান্য আন্দোলনের বন্দিনীদের সঙ্গে একত্র বাসের সুযোগ আমাদের ছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ করলেন তাঁদের নীতির পরিবর্তন। হয়ত ভাবলেন, আমাদের সঙ্গ অহিংস বন্দিনীদেরও সহিংস ক'রে তুলবে। এই পরিবর্তিত নীতি কার্যে পরিণত করা হ'ল। সুনীতি আর আমি চালান হলাম মেদিনীপুর জেলে। কোথায় যে নিয়ে যাবে সেটা কিন্তু আগে আমাদের কাছে প্রকাশ করা হ'ল না। সকলের মনে উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ; কোথায় আমাদের নিয়ে যাচ্ছে? অশ্রুসিক্ত চোখে কল্যাণীদিরা বিদায় দিলেন আমাদের।

হাওড়া স্টেশনে যখন আমাদের নিয়ে গেল তখনকার একটা ঘটনা অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে আমাদের অন্তরে। স্টেশনের কুলিরা পুলিশের শাসনকে অগ্রাহ্য ক'রে আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে সমবেতকণ্ঠে জয়ধ্বনি ক'রে উঠল। স্বাধীনতার সৈনিকদের প্রতি এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রীতির প্রকাশ আমাদের বিহ্বল ক'রেছিল। যাদের আমরা অশিক্ষিত ব'লে, নোংরা বলে, তুচ্ছতার মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছি, বঞ্চিত করেছি মানুষের অধিকার থেকে, তারাই সেদিন প্রমাণ করল তাদের আচরণে যে, ইংরেজদের পদলেহী ভদ্রসন্তানদের চেয়ে মানুষ হিসেবে কত বড় তারা। আমাদের নিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিলে। সেই চলমান ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে তারাও ছুটছে, মুখে সোল্লাস জয়ধ্বনি। ভারত-জননী তাঁর মাটির সন্তানদের দিয়ে সেদিন যে অভিনন্দন-আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন, জীবনে তা কোনদিনই ভোলবার নয়!

মেদিনীপুরে

সন্ধ্যার সময় পৌঁছুলাম মেদিনীপুরে। গাড়ি থেকে নেমে মন খারাপ হয়ে গেল। সমস্ত পরিবেশের মধ্যে যেন একটা প্রাণহীন নির্জীবতা। জেলের ফটকে পা দিতেই আমাদের কানে ভেসে এল 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি। তাকিয়ে দেখি, জেলের ভেতর একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে ক'জন রাজনৈতিক বন্দী আমাদের স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছেন 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কণ্ঠেও প্রতিধ্বনিত হল সে মন্ত্র। পরে জানতে পেরেছিলাম, এঁদের মধ্যে ছিলেন ড্যালহাউসি ষড়যন্ত্র মামলার আসামী দীনেশ মজুমদার, মেছুয়াবাজার বোমার মামলার শচীন কর প্রমুখ। মনে ভরসা হল, এখানেও আমরা একা নই, নিঃসঙ্গ নই। এক পথেরই পথিক জেলের বিভিন্ন বিভাগে ছড়িয়ে আছে। পরস্পরের প্রীতি ও শুভেচ্ছা অদৃশ্যভাবে জড়িয়ে থাকবে পরস্পরকে। এই দীনেশ মজুমদার সম্বন্ধে পরে অনেক মজার গল্প শুনেছিলাম। তিনি নাকি গান পছন্দ করতেন না। আর তাঁকে খেপাবার জন্যেই শচীন কর তাঁর পাশে ব'সে গীতাঞ্জলির প্রথম গান 'আমার মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে' থেকে আরম্ভ ক'রে 'দিবস যদি সাঙ্গ হল না যদি গাহে পাখী' পর্যন্ত সবগুলো গান বিকট সুরে ও বিকটতর ভঙ্গীতে গেয়ে যেতেন একে একে। জেনানা-ফাটকে আমাদের নিয়ে যাবার পর সেখানেও দেখি আমরা অবাঞ্ছিত নই। মেদিনীপুরের বিখ্যাত নারীকর্মী চারুশীলা দেবী উন্মুখ আগ্রহে প্রতীক্ষা ক'রে রয়েছেন আমাদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে। গান্ধীজীর অহিংসা-মন্ত্রে দীক্ষিতা এই মহিলা অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিতা দু'টো মেয়েকে নিঃসঙ্কোচে বুকে টেনে নিলেন নীতিগত সমস্ত পার্থক্য বিস্মৃত হয়ে। এই কথা আমরা অন্য সময়েও উপলব্ধি করেছি যে, কোন মতের অমিল

কারাগারের অভ্যন্তরে পরস্পরের মনের মিলনকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। মেদিনীপুর জেল তখন সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের বন্দী ও বন্দিনীতে পরিপূর্ণ। তাঁদের সবার প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উৎসারিত হয়েছিল আমাদের প্রতি। মেদিনীপুরের বিখ্যাত কংগ্রেসকর্মী শ্রীযুক্ত মন্মথ দাশের মাও তখন জেলে। তিনি একদিন 'ইণ্টারভিউ' থেকে ফিরে এসে বললেন, 'মা, তোমাদের একজন খুব ভাল সঙ্গী আসছে।' তার আগেই একজন জেল কর্মচারীর মুখে জানতে পেরেছিলাম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বাঙলার লাট স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসনকে লক্ষ্য ক'রে গুলি ছুড়েছে একজন বাঙালী মেয়ে। গুলি যদিও ব্যর্থ হয়েছে তবু সার্থক হয়েছে তার উদ্দেশ্য। অপরাজেয় বিপ্লবীশক্তির বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ঘোষিত হয়েছে বিচিত্রভাবে, বিচিত্ররূপে। জেলে ব'সেই সেই অজানা-অচেনার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম। পরে জানতে পারলাম, ইনিই আমাদের সেই বীণাদি—যাঁর কথা আমরা কারাজীবনের প্রারম্ভেই শুনেছিলাম কল্যাণীদির মুখে। অধীর আগ্রহে দিন গুণছি, কবে বীণাদি এসে পৌঁছুবেন। ন' বৎসরের কারাবাসের হুকুম হয়েছে তাঁর প্রতি।

নতুন সাথী

একদিন অপরাহ্ণে আমরা কয়েকজন মিলে কারা-প্রাঙ্গণে পদচারণা ক'রে বেড়াচ্ছি। 'লক-আপে'র সময় হয়ে এল প্রায়। এমন সময় এসে পৌঁছুলেন খদ্দরপরা দীর্ঘতন্বীদেহ স্মিতহাস্যময়ী এক তরুণী। অপূর্ব স্নেহকোমল মুখ, দু'টি চোখে প্রখর বুদ্ধির দীপ্তি। ছুটে গিয়ে আকুল আগ্রহে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনিই বীণা দাশ ?'

কোন কথা না ব'লে আমার দু'টো হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলেন। সেই পরমক্ষণে আমাদের দু'জনের অন্তরের মধ্যে হয়ে

গেল অচ্ছেদ্য গ্রন্থিবন্ধন। দীর্ঘকালের একত্রবাসের মধ্য দিয়ে কত নিবিড়ভাবে পেয়েছি তাঁর সঙ্গ, পেয়েছি তাঁর অন্তর-ঐশ্বর্যের শত পরিচয়। কিন্তু প্রথম দিনের সেই মিলন-মুহূর্তটি অপূর্ব জ্যোতিতে ভাস্বর হয়ে রয়েছে আমার অন্তর্লোকে। সে আমার অবিস্মরণীয় সম্পদ।

বীণাদির মুখ থেকে চোখ ফিরিয়ে দেখি, বুলবুল (সুনীতি) কখন স'রে গেছে আমাদের পাশ থেকে। ডেকে বলি, 'বুলবুল, বীণাদি এসেছে, আয়।'

সে কিন্তু এল না। অতি সাবধানী তার মন। যাকে সে বন্ধুভাবে গ্রহণ করে তাকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করে; না থাকে এতটুকু ফাঁক, না থাকে ফাঁকি। কিন্তু গ্রহণ করার আগে ওর সাবধানী মনের বিশ্লেষণ চলতে থাকে। পরখ করে, যাচাই করে, তারপরে সে গ্রহণ করে, এখানেই ছিল তার বৈশিষ্ট্য। কিছুদিন যেতে না-যেতে বীণাদির মধুর স্বভাবের পরশ পেল সেও, দূর হয়ে গেল সাবধানী মনের ব্যবধান। তখন কে বলবে, বীণাদি তার আপন বড়বোন নয়!

এর পরে একদিন বীণাদি হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'বুলবুল, শান্তিই তো প্রথম আমাকে অভ্যর্থনা জানাল, তুমি তো দূরেই স'রে ছিলে।'

চট ক'রে জবাব দিলে ও, 'আমি ত' শান্তির মত বোকা নই। আমি সবাইকেই আগে study করি; ভাল লাগলে মিশি, না হলে মিশি না।'

ঢাকা জেলে

বীণাদি আর অন্যান্য সাথীদের সাহচর্যে পনেরটা দিন কেটে গেল একটা মধুর স্বপ্নের মত। তারপর আসর-ভাঙার হুকুম এসে গেল। আমার ওপর হুকুম এল ঢাকা জেলে বদলি হওয়ার। বিদায়ের করুণ

মুহূর্ত এগিয়ে এল। শুধু যে ছাড়তে হল বীণাদি আর কারাজীবনের অন্যান্য সঙ্গীদের তা নয়, ছেড়ে আসতে হল তাকেও যে ছিল আমার আবাল্য-সঙ্গী, সহকর্মী—সেই সুনীতিকেও। ঢাকায় এসে পেঁছুলাম সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশের মধ্যে। বই-ই হল সেখানে একমাত্র সঙ্গী। অবসর সময় একলা ব'সে রবীন্দ্রসংগীত গাইতাম। বহুর মাঝে একলা থাকার অভিজ্ঞতা জীবনে আমার বহু হয়েছে, কিন্তু ঢাকা জেলেই তার সূচনা। বেশীদিন কিন্তু আমাকে একলা থাকতে হল না। সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারীরা দণ্ডাদেশ নিয়ে একে একে ভিড় জমাতে লাগলেন ঢাকা জেলে। তাঁদের মধ্যে ৩।৪ জন আমার সমবয়সী। তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হতে সময় লাগল না। কর্তৃপক্ষ শঙ্কিত হয়ে উঠলেন, এদের মধ্যেও হয়ত রক্তবিপ্লবের বীজ বপন করতে পারি আমি। ঢাকা জেলেও তাই আমার স্থায়ী ঠাঁই মিলল না। কর্তৃপক্ষ আবিষ্কার করলেন, ঢাকা জেলের বন্দী ও বন্দিনীরা সব কতকগুলো বারুদের স্তূপ, আর আমি একটা চকমকি পাথর, ঠুকলেই আগুন জ্বলবে। ঢাকা জেল থেকেও তাই আস্তানা গুটাতে হল। হুকুম হল যেতে হবে রাজসাহী। সেখানে আমি একা। সহকর্মী কোন নারীর অস্তিত্ব ছিল না সেখানে। একলা রুদ্ধঘরে মাঝে মাঝে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠত। আমার ঘরের সামনে ফুলের বাগানে অজস্র ফোটা ফুলের হাসি আমায় ভুলিয়ে রাখত। কিছুকাল পরে স্বল্পকালের জন্য পেলাম একজন সাথী, নাম তার শান্তি সেন। অস্ত্র-আইনের আওতায় ফেলে বিচাবাধীন বন্দিনী হিসাবে তাকে ধ'রে নিয়ে আসা হয়েছে আসামের গোয়ালপাড়া থেকে। সরল-সুন্দর মুখখানি, দেখলেই ভাল লাগে। যে ক'টা দিন ছিল, জেল-টাকে সজীব করে রেখেছিল। আমাদের ছু'জনের মধ্যে ছিল প্রকৃতিগত স্বাজাত্য। আমার প্রভাব থেকে মুক্ত করবার জন্যে তাকে প্রেসিডেন্সি জেলে চালান ক'রে দেওয়া হল। পনের দিন পর পর তাকে কলকাতা থেকে সেখানে নিয়ে আসা হত আদালতে হাজির করবার জন্যে।

তার সঙ্গে আর আমার সাক্ষাৎকার ঘটেনি, কোথায় আছে তাও জানিনে। কিন্তু তার সাহচর্যের স্মৃতি, তার স্নেহের স্পর্শ ভুলতে পারিনি আজও।

আবার মেদিনীপুর

বছর না পেরোতেই আবার ফিরে এলাম মেদিনীপুর। বহুদিন পর বীণাদি আর বুলবুলকে পেয়ে প্রাণ নেচে উঠল। কথা ফুরুতেই চায় না। জানতে পেলাম, সেখানকার মেট্রন ও জেলার দু'জনে একজোট হয়ে লেগেছে বুলবুলকে অসম্মান করতে, তাকে কষ্ট দিতে। তাদের হাতের অস্ত্র সুনীতি তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী। রাজনীতিক বন্দীদের মধ্যে এই যে শ্রেণীবিভাগ এটা যে কী মর্মান্তিক সেটা আমরা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করতাম যখন আমাদেরই সহকর্মীদের আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে সাধারণ কয়েদীদের মত ব্যবহার করা হত। এ ছাড়াও, মেট্রন ও জেলার এ দু'জনের মধ্যে এমন একটা কুশ্রী সম্পর্ক প্রত্যক্ষ করা গেল যার কদর্যতা আমাদের অন্তরাত্মাকে বিদ্রোহী ক'রে তুলল। বদ্ধপরিকর হলাম এই অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে। বললাম, 'বীণাদি, এ অন্যায় কিছুতেই সইব না।'

"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে।"

এই দীক্ষামন্ত্র বারবার আবৃত্তি করতে লাগলাম।

রাজসাহী থেকে ফিরে আসার পরের দিনই একটা তুচ্ছ কারণ নিয়ে মেট্রনের সঙ্গে হল আমার সংঘর্ষ। সকালে চা-রুটি প্রভৃতি অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দিনীদের যা বরাদ্দ, তা এল। মেট্রন সুনীতিকে আমাদের সঙ্গে খেতে দেবে না। বাদানুবাদ উগ্র থেকে উগ্রতর হয়ে উঠল।

বীণাদির ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। বললেন, 'জেলারের সঙ্গে তোমার যে কাণ্ডকারখানা তাতে তোমার যথার্থ স্থান এখানে নয়, নোংরা পল্লীতে। আমাদের জেলের কানুন শেখাতে এস না।'

প্রতিবিধানের উপায় আগে থেকেই স্থির করা ছিল। সেদিন থেকেই আমরা অনশন আরম্ভ করলাম। কর্তৃপক্ষকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলাম যে জেলার আর মেট্রনকে এখান থেকে সরাতেই হবে। আর তা যদি না হয় তাহলে তাদের অশুচি সংস্পর্শ থেকে মুক্তি দেবার জন্যে আমাদের বদলি করতে হবে অন্যত্র। আমাদের এই অনশনের সংবাদ যখন বাইরে ছড়িয়ে পড়ল তখন চারদিকে সাড়া পড়ে গেল।

কর্তৃপক্ষের টনক নড়ল। জেল-সুপারিনটেনডেণ্ট ক্যাপ্টেন ড্রামণ্ড এলেন সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে।

আমরা কিন্তু আমাদের সংকল্পে অটল। আগের দাবিরই পুনরুক্তি ক'রে বললাম, 'মেট্রন ও জেলারের অপসারণ চাই।'

অদ্ভুত লোক এই ড্রামণ্ড! ভদ্র, বিচক্ষণ, সহানুভূতিশীল। প্রথম প্রথম রাজকর্মচারিসুলভ আচরণই তিনি ক'রেছিলেন আমাদের সঙ্গে। পরস্পরের কাছ থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন ক'রে সংকল্পচ্যুত করার চেষ্টাও তিনি করেছিলেন। কিন্তু ব্যর্থ হল তাঁর সে অপপ্রয়াস। নিজেই তখন হার মানলেন। আমরা একক কোন আলোচনাতেই সম্মত হলাম না। তখন গাড়ি ক'রে নিজেই নিয়ে গেলেন আমাকে আর বুলবুলকে (সুনীতিকে) যেখানে বীণাদিকে আগেই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আমাদের দাবি মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অনশন ভঙ্গ করার অনুরোধ জানালেন। এর মধ্যে কলকাতা থেকে বীণাদির বাবা, দাদা ও বৌদি এসে পড়েছেন। আমাদের অনশনের তখন অষ্টম দিন। সৌম্যদর্শন, ঋষিকল্প, আদর্শ মানুষ, বীণাদির বাবা। দেখলেই মাথা নুয়ে পড়ে শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে। অনশন ভঙ্গের পর আমাদের মাথায় ও পিঠে হাত বুলিয়ে নিজের হাতে খাইয়ে দিতে লাগলেন।

আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিচিত্র ধারার সঙ্গে আমাদের নতুন ক'রে পরিচয় ঘটল। এর মধ্যে ন্যায় ও নীতি অপেক্ষা কর্মচারীগোষ্ঠীর মর্যাদারক্ষার জেদের প্রাধান্য অনেক বেশী। জেলার ও মেট্রনের সম্পর্কের মধ্যে যে কুশ্রীতা ছিল তার স্বরূপ আমরা উদ্ঘাটন ক'রে দিলাম। অন্যায়ের প্রতিরোধ করার সংকল্পে অবিচল থেকে নিজেদের দাবির যৌক্তিকতা আমরা প্রতিষ্ঠিত করলাম। কর্তৃপক্ষকে হার মানতেই হল। তাঁরা উপলব্ধি করলেন আমাদের সংকল্পের যাথার্থ্য। কিন্তু এসে দাঁড়াল প্রেস্টিজ রক্ষা করার সরকারী নীতি। মেট্রন ও জেলারের অপসারণ ঘটল না, তার বদলে আমাদেরই আস্তানা গুটাতে হল। সুনীতি গেল রাজসাহী। মুখে হাসি ফুটিয়ে সহজভাবে বিদায় নিল সে। পরের দিন আমাদের পালা। হিজলী বন্দিশালায় যাবার পরোয়ানা এল।

হিজলীতে

হিজলী বন্দিশালা তখন সরগরম। এগারসনি ব্যবস্থা বাংলা দেশের সংগ্রামরত ও সংগ্রামোন্মুখ ছেলেমেয়ে কাউকে নিষ্কৃতি দেয়নি। গতানুগতিক জীবনযাত্রার অভ্যস্ততা থেকে অপসৃত হয়ে যারা স্বপ্নলোকের বন্ধুর পথে পা বাড়িয়েছিল তারা দলে দলে এসে ভিড় ক'রে তুলল হিজলী, দেউলী, বহরমপুর, বক্সা বন্দিশালাগুলোতে। সহজ অনাবিল জীবন। না আছে অতীতের দিকে ফিরে দীর্ঘশ্বাস ফেলা, না আছে তাদের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ভবিষ্যতের আশঙ্কায় বিপর্যস্ত মানসিকতা। বর্তমানকে নিজেদের হৃদয়ের প্রাচুর্য দিয়ে অপরূপ ক'রে তুলে বন্দিশালার আকাশ-বাতাস পর্যন্ত সজীব ক'রে তুলেছিল।

ছ'ধারে শালগাছের সারিদেওয়া লাল সুরকীঢালা রাস্তা দিয়ে যখন হিজলীর দিকে যাচ্ছিলাম তখন এত ভাল লাগছিল! ইচ্ছে হচ্ছিল, গাড়ি থেকে নেমে প'ড়ে সরল পুষ্ট সজীব শালগাছগুলোর ছায়ায় একটু ব'সে বুকভরে টেনে নিই সেখানকার উন্মুক্ত বাতাস। কিন্তু মনের ইচ্ছা মনেই রইল। আমাদের রথচক্র ঘর-ঘর ক'রে রাস্তার লালধুলো উড়িয়ে এগিয়ে চলল। পথে হিজলী ক্যাম্প! রাজবন্দীর দল সমবেতকণ্ঠে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি ক'রে উঠল। আশ্চর্য মানুষের মন! প্রকৃতির উদার আমন্ত্রণে মন যখন লঘুপক্ষ বিহঙ্গের মত পাখা মেলতে চাইছে ঠিক সেই মুহূর্তে এই একটিমাত্র ধ্বনিতে সমস্ত পরিবেশ একেবারে পালটে গেল। মুক্তির হাওয়া কোথায়? এ যে বন্দী-নিবাস! সাম্রাজ্যবাদী কূটবুদ্ধি 'অর্ধনগ্ন রাজদ্রোহী ফকির'কে ধাপ্পা দিয়ে ভারতবর্ষের উদ্বেলিত জনতার মাঝখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে গোলটেবিল বৈঠকের নিশ্চিন্ত দূরত্বের ব্যবধানে। এদিকে সন্ত্রাসবাদীর দুর্নাম দিয়ে বাঙলার বিপ্লবী তরুণ-শক্তিকে বন্দী-নিবাসে পিষে মারবার সনাতন পদ্ধতি অব্যাহতভাবে চলছে। চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনের অপমান বিদেশী শাসকরা কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। অমানুষিক অত্যাচারে বাঙলার যুবকদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে হবে, এই ছিল তাদের পৈশাচিক সংকল্প। এই হিজলী বন্দী-নিবাসেই সন্তোষ মিত্র আর তারকেশ্বর সেনগুপ্তকে গুলি ক'রে হত্যা ক'রে তারা সেই পৈশাচিক হিংস্রতাকেই নগ্ন বর্বররূপে প্রকট ক'রে তুলেছিল।

শাসকদের আচরণে সেদিন যে আদিম বর্বরতা আত্মপ্রকাশ করেছিল, তা শুধু তরুণ বাঙলাকেই উচ্চকিত করে নি, কবিগুরুকে পর্যন্ত বিচলিত করে তুলেছিল। মুখে পবিত্র খৃস্টধর্মের শপথ আর ক্রুশের বাণী বহন ক'রে যারা ছনিয়ায় ঘুরে বেড়ায় তাদের শ্রেণী-বিশেষের কলুষিত আত্মার এ কি কদর্য মূর্তি! হিজলীর এই অমানুষিক ঘটনার কথা স্মরণ ক'রে খৃস্টজন্মদিনে তাই চিরশান্তির বাণীদূত

রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেও শুনতে পাই বিচলিত বিশ্বাসের সংশয়-আকুল প্রশ্ন—

"ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে,
দয়াহীন সংসারে,—
তারা ব'লে গেল 'ক্ষমা কর সবে' বলে গেল ভালবাসো—
অন্তর হ'তে বিদ্বেষ বিষ নাশো'।
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির দ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে॥
আমি যে দেখেছি, গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে ;
আমি যে দেখেছি, প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে,
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে॥
কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীতহারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে—
তাইতো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো ?"

বন্দিশালার বিরাট লৌহকপাট খুলে গেল। মনে হল যেন অজগরের মুখব্যাদান। আমাদের গ্রাস ক'রে আবার মুখ বন্ধ হয়ে গেল তার। জেলের ভেতর ঢুকবার পূর্বমুহূর্তেই জেল কর্তৃপক্ষ

আমাদের সাবধান ক'রে দিলেন যেন ওখানকার কোন দলেই আমরা যোগদান না করি। একথা বলেও শাসিয়ে দেওয়া হল যে, রাজবন্দী-দের সঙ্গে যদি আমরা মেলামেশা করি তাহলে হিজলী বন্দিশালা থেকে আবার আমাদের মেদিনীপুরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আমি আর বীণাদি দু'জনে দু'জনের মুখের দিকে তাকালাম। মনে মনে হাসলাম, অচলায়তনের পাষাণ-প্রাচীর ভাঙবার মরণপণ প্রতিজ্ঞা যাদের, তাদেরও খড়ির দাগটানা গণ্ডীর মধ্যে বাঁধতে চায় এরা! ভেতরে ঢুকতেই দেখি, সব রাজবন্দীরা দরজার কাছে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের স্বাগত-সম্ভাষণ জানাবার জন্যে। পুটুদি (শ্রীসুহাসিনী গাঙ্গুলী চট্টগ্রাম অস্ত্রাগারলুণ্ঠন মামলার আসামী শ্রীগণেশ ঘোষ, শ্রীলোকনাথ বল প্রমুখের সঙ্গে চন্দননগরে ধৃত হয়ে কিছুদিন হাজত বাসের পর মুক্তি পান। ১৯৩২ সালে পুনরায় সংশোধিত ফৌজদারি আইনে ধৃত হয়ে হিজলীতে ছিলেন) 'মনু' বলে ছুটে এসে বীণাদিকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, আর প্রফুল্ল (শ্রীপ্রফুল্ল ব্রহ্ম) এসে আবেগভরে আমার ডান হাতখানা তার দু'হাতের মধ্যে নিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

বোঝাপড়া

বাইরের ঘটনাপ্রবাহের উত্তাপ ভেতরের মানুষগুলোকেও চঞ্চল ক'রে রাখে। নানা মতবাদ ও ভাবীকালের কর্মপন্থার বিভিন্ন ধারা নিয়ে এদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা, বিচার-বিতর্কের বিরাম নেই। পরস্পর-বিরুদ্ধ মতবাদকে কেন্দ্র ক'রে বিভিন্ন চক্র গড়ে উঠেছে এদের মধ্যে। আমরা কিন্তু মনের দিক দিয়ে এর জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে আমরা আত্মাহুতি দিতে গিয়েছিলাম। যদিও ঘটনাচক্রে আমরা ভিন্ন এক পরিস্থিতিতে এসে পড়েছি তবু আদর্শ-সিদ্ধির জন্যে আত্মবিলোপ সাধনের মহাসংকল্পকে আমরা কোন

দলগত বিতর্কের মধ্যে টেনে আনতে পারছিলাম না। অন্তরে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সংশয়ের দোলা। কিন্তু পরিবেশ আর পরিজনকে অস্বীকার করার উপায় কোথায়? ধীরে ধীরে আমরা মনকে প্রস্তুত ক'রে তুললাম ভাবীকালের সংগ্রামে আমাদের যথার্থ ভূমিকা গ্রহণ করবার জন্যে। তারই প্রয়োজনে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের পর্যালোচনা আমাদের কারাজীবনের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল। রাজনৈতিক মতবাদকে অতিক্রম ক'রে নেতাদের ব্যক্তিগত ও ক্ষুদ্র দলগত স্বার্থের সংঘাতও মাঝে মাঝে প্রখর হয়ে উঠত বৈকি! রেষারেষি প্রকট হত ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে; দলগত বিদ্বেষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠত। তিক্ততার সৃষ্টি যে হত না, তা নয়, কিন্তু আত্মপরীক্ষার মহাসুযোগ পাওয়া যেত এতে। একদিন যখন বিতণ্ডা প্রখর হয়ে উঠেছে তখন কমলাদি (শ্রীমতী কমলা দাশগুপ্তা, ড্যালহাউসি বোমার মামলায় ১৯৩৯ সালে ধৃত হয়ে কিছুদিন হাজতবাসের পর প্রমাণাভাবে মুক্তি পান। সংশোধিত ফৌজদারি দণ্ডবিধির আওতায় ফেলে হিজলী বন্দিশালায় তাঁর স্থান ক'রে দেওয়া হয়) বললেন, 'বীণা, শান্তি, সুনীতি এরা তো এদের কাজে প্রমাণ করেছে যে এরা সকল দলের ঊর্ধ্বে। এদের নিয়ে গৌবব করার এবং এদের নিজেদের ব'লে ভাবার অধিকার তো সকল দলেরই আছে। এদের কেন টেনে আনবো দলগত বিভেদের মধ্যে?'

আমার কারাজীবনের অন্যতম পরম সঞ্চয় আমার এই কমলাদি। ধীর-স্থির, শান্ত-সংযত মানুষটির ভেতর স্নেহের যে ঝরনাধারা বয়ে চলছে অন্যের অলক্ষ্যে, তার পরিচয় যতই পেতে লাগলাম, ততই গভীর হতে গভীরতর হতে লাগল আমাদের দু'জনের বন্ধন। সেই বন্ধন আজও পর্যন্ত রয়েছে অটুট, অমলিন।

আমরা যখন হিজলী গিয়ে পৌঁছাই, সে সময় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন সাড়া পড়ে গিয়েছে। হরিজনদের উন্নয়নের জন্তে গান্ধীজী যারবেদা জেলে প্রায়োপবেশনের সিদ্ধান্ত জানালেন। সেই সিদ্ধান্ত জানতে পেরে সরকার দিলেন তাঁকে মুক্তি। সর্তাধীনে মুক্তি পেয়ে গান্ধীজী ছ' সপ্তাহের মধ্যে আইন-অমান্য আন্দোলন বন্ধ ক'রে দিলেন। এই নিয়ে কংগ্রেসের ভেতরে-বাইরে বহু সমালোচনা হতে লাগল। সুভাষচন্দ্র অসুস্থ হয়ে তখন ছিলেন ইউরোপে। ভিয়েনায় রয়টারের প্রতিনিধির কাছে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র ও ভি. জে. প্যাটেল গান্ধীজীর এই কার্যের তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। তাঁরা এমন কথাও বললেন, এত বড় আন্দোলনের নেতৃত্ব করার সামর্থ্য গান্ধীজী হারিয়েছেন; তাঁর পক্ষে এখন রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করাই উচিত। একেবারে পুরোভাগের কংগ্রেস-নেতার মুখ থেকে গান্ধীজীর এমন বিরুদ্ধ সমালোচনা আগে আর শোনা যায় নি। সমস্ত দেশ চঞ্চল হয়ে উঠল। আমাদের মনের মধ্যেও তখন সুভাষ-প্যাটেলের কথাগুলি অনুরণিত হচ্ছিল। কেবলই প্রশ্ন জাগছিল মনে—'কেন এই দৌর্বল্য? কিসের জন্তে এই সংগ্রাম বিরতি? চৌরিচৌরার ভুলের কি পুনরাবর্তন ঘটতে থাকবে এমনি ক'রে?'

কংগ্রেসের আইন-অমান্য আন্দোলনের প্রবল গণবিক্ষোভ পরিণতি লাভ করল গণ-আন্দোলন প্রত্যাহারে এবং ব্যক্তিগত আইন-অমান্য আন্দোলনের অবোধগম্যতায়। বাঙলার বিপ্লবীশক্তিও চুপ ক'রে ছিল না। কয়েকমাস আগেই পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ পরিচালনা করলেন শ্রীপ্রীতি ওয়াদ্দাদার। ক্লাব বিধ্বস্ত ক'রে তিনি বিষপানে আত্মহত্যা করলেন। মাস্টারদা (বিপ্লবী সূর্য সেন) নিজেই বলেছিলেন, 'প্রীতিকে পাঠিয়েছিলাম আমি একহাতে আয়ুধ এবং অন্যহাতে অমৃত দিয়ে।'

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই মাস্টারদা, তারকেশ্বর দস্তিদার (চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম আসামী ; বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন), কল্পনা দত্ত (চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন-মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিতা) প্রমুখ ধরা পড়লেন। অন্যান্য স্থানে বিশিষ্ট ইংরেজ রাজকর্মচারীদের উপর আক্রমণ হতে লাগল। বিপ্লব-আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছেলেমেয়ে দলে দলে বিভিন্ন বন্দিশালা আকীর্ণ ক'রে তুলতে লাগল। হিজলী এসে আমি আগেকার পরিচিত যাঁদের পেলাম তাঁরা হলেন কুমিল্লার শ্রীমতী প্রতিভা ভদ্র, শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভা দেবী ও শ্রীযুক্তা ইন্দুমতী সিংহ।

বিমলদির সাথে আমার পরিচয় ১৯৩১ সালে কুমিল্লা জেলা-ছাত্র-ছাত্রী সম্মেলনে। সেই সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। আমার অটোগ্রাফ খাতায় তিনি লিখেছিলেন—'আপনার মান রাখিতে জননী আপনি কৃপাণ ধর।'

আমাদের ধরা পড়ার সংবাদ যখন কলকাতার কাগজে বের হয় তখন এই ঘটনাসম্পর্কে টেলিফোনে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বিমলদি নাকি বলেছিলেন,—'শান্তির খাতায় কী লিখে দিয়ে এসেছিলেন, মনে আছে তো ?'

হিজলীতে বন্দী-জীবন

হিজলীতে আমাদের জীবন মোটেই একঘেয়ে ছিল না। বাংলা দেশের বিপ্লবী নারীশক্তির একত্র সমাবেশ ঘটেছিল এখানে। পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, মেলামেশা, ভাবের আদান-প্রদান প্রভৃতির ভেতর দিয়ে আমরা নিজেদের গ'ড়ে তুলছিলাম দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পরবর্তী অধ্যায়ের জন্যে। শুধু যে রাজনৈতিক আলোচনায় সময় কাটত তা নয়, আনন্দ-সৃষ্টির নিত্যনতুন উপায়

উদ্‌ভাবন আমাদের হিজলী জীবনের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। গান, কবিতা, এ যেন আমাদের লেগেই আছে। যতটুকু আমাদের জীবনের পরিসর, ততটুকুকে আমরা সুন্দর ক'রে তুলব। তারপর আসবে ছুটি নেবার পালা। সেও হবে এমনি সুন্দর, এমনি মধুর।

সংসার মাঝে কয়েকটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর
দু'একটি কাঁটা করি দিব দূর
তারপরে ছুটি নিব।

আমরা যে সৌন্দর্য ও মাধুর্যের কথা ভাবতাম তা ক্ষুদ্র সুখ-বিলাসের ভাবালুতা নয়। আদর্শ জীবনযাপনের আনন্দ উপলব্ধির কথাই ভাবতাম। আমাদের মনের মধ্যে গভীর সুরের লীলাই চলত। মৃদুসুরের খেলায় এ প্রাণ ব্যর্থ করব, এমন কথা ভেবেছি ব'লে মনে পড়ে না।

হিজলীতে আমরা যাবার পরে কল্যাণীদি ও নীনিদি (বনলতা দাশগুপ্তা) এসে পড়লেন। ওঁদের পৌঁছুবার পরে সবাইকে নিয়ে আমাদের একটা আড্ডা জমত। চীনাবাদাম ভাজা, পাঁপর ভাজা আর মর্টনের টফির সদ্ব্যবহার চলত এবং এগুলি যোগাতেন আমাদের পুঁটুদি।

হিজলীতে মেজদির (কল্পনা দত্ত) আবির্ভাব একটি স্মরণীয় ঘটনা। এর আগে কাগজে দেখেছি তাঁর যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ হয়েছে। যে-কোনদিন তিনি আমাদের মধ্যে এসে পড়বেন, এ প্রত্যাশা ছিল আমাদের মনে। একদিন ভোরবেলা আমি আর বীণাদি তকলিতে সূতো কাটছি। সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিতা আমরা; সরকারি বিধান অনুযায়ী শ্রম আমাদের করতেই হত এবং সে শ্রম ছিল তকলিতে সূতো কাটা। নিজের ইচ্ছার সঙ্গে জড়িত হয়ে যে কাজ

আনন্দের উপকরণ হয়ে ওঠে, সেই কাজই যখন অন্যের ইচ্ছায় বাধ্য হয়ে করতে হয় তখন সেটা যে কী গ্লানিজনক হয় তার প্রমাণ আমাদের এই তকলি-কাটার ইতিহাস।

দূর থেকে পুঁটুদির গলা শুনতে পেলাম, 'ভুলু এসেছে।'

আমরা কিন্তু প্রথমে বিশ্বাসই করিনি। কারণ ঈশপের মিথ্যাবাদী রাখালের মতই আমরা বন্ধুদের চমকে দিতাম নতুন বন্ধুদের আবির্ভাব ঘোষণা ক'রে। ভাবলাম এও বুঝি তাই।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই মেজদি নিজেই চেঁচিয়ে উঠলেন—'মনুদি, আমি ভুলু এসেছি।'

বীণাদি ও মেজদি, দুইজনেই বেথুন কলেজেব ছাত্রী। সেই সূত্রে আগেই ছিল তাঁদের পরিচয়। বীণাদির মুখে গল্প শুনেছি, ১৯২৯ সালে মেজদিরা যখন ম্যাট্রিক পাশ করে এসে বেথুন কলেজে ভর্তি হলেন তখন ওঁদের দলেব মধ্যে সুরমা, পান্না গুহ, নাতুদি (কমলা চ্যাটার্জি: ইনিও সংশোধিত ফৌজদারি আইনে আবদ্ধ ছিলেন হিজলীতে)—এঁদের দেখে বীণাদিদের খুব হিংসে হত। বীণাদি তাঁর বন্ধুদের বলতেন, কল্পনাদিদের মত ও'রাও কেন এইরকম প্রাণ-প্রাচুর্যে চঞ্চল হয়ে উঠতে পারেন না? কল্পনাদিকে দেখে আমাদেরও মনে হত, উনি জীবনটাকে কেঁদে ভাসিয়ে দেওয়ার চেয়ে হেসে উড়িয়ে দেওয়া শ্রেয়তর মনে করেন।

মেজদি স্নান ক'রে আমাদের ঘরে এসে বসেছেন। পুঁটুদি, নাতুদি, সুধাদি, কমলাদি—এঁরা সবাই আছেন। আমাকে গান গাইতে অনুরোধ করা হল। গাইলাম, 'ফিরে চল আপন ঘরে।'

এত গান থাকতে কেন সেদিন ঐ গানটিই মনে পড়েছিল জানি না, হয়ত তার সঙ্গে তনখকার মনের কোন একটা সুবের মিল ছিল।

গানে আমার কৃতিত্বকে স্বীকার ক'রে নিয়ে মেজদি আমাকে শাসালেন, শারীরিক কলাকৌশলে উনি আমাকে হার মানাবেনই। সেখানে আমার হার হয়েছিল সত্যিই।

কারাগারে রবীন্দ্রনাথ

আমাদের ওপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল সুগভীর। বিপ্লবীজীবনে ও কারাজীবনে আমরা তাঁর কাব্য থেকে পেয়েছি প্রেরণা ও আনন্দ। ক্লীবত্ব পরিহার ক'রে বীর্যবত্তায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে সংগ্রামে লিপ্ত হবার বাণী তাঁর কাছ থেকে আমরা পেয়েছি; জাতীয়তার উদ্বোধন মন্ত্র তিনি সঞ্চারিত করেছেন আমাদের মধ্যে। তাই রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে রবীন্দ্রভক্তের সংখ্যা অল্প ছিল না। ১৯৩১ সালে যখন রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বিশ্বকবির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদিত হয়েছিল, তখন বন্দী-নিবাসেও যথাযথ শ্রদ্ধায় কবিগুরুর জন্মোৎসব প্রতিপালিত হয়। এই উপলক্ষে বক্সা-বন্দিশালার রাজবন্দীরা রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন পাঠান, তারই উত্তরে তিনি লিখেছিলেন,—

"নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন।
পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা, সংগীত না মানিল বন্ধন,
ফোয়ারার রন্ধ্র হ'তে
উন্মুখর ঊর্ধ্ব স্রোতে
বন্দীবারি উচ্চারিল আলোকের কী-অভিনন্দন।"

কবিগুরুর এই আশীর্বাণী অনেকেরই কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরত।

হিজলী বন্দিশালায় সিপাহীরা নিরস্ত্র বন্দীদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার করে, অন্ধকারে বেপরোয়া গুলীচালনার ফলে যেভাবে সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেনগুপ্ত নিহত হন, তার প্রতিবাদে কবিগুরু মনুমেণ্টের তলায় দাঁড়িয়ে ময়দানের সমবেত বিপুল

জনসমাবেশে যে তেজোদৃপ্ত ভাষণ দিয়েছিলেন তাও বন্দীমাত্রকেই গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় অভিভূত ক'রে রেখেছিল। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় যদিও কবি আপনাকে আহ্বান করেছিলেন 'উন্মুক্ত অম্বর তলে জনতার মাঝখানে' 'মূঢ় মূক মুখে' ভাষা দেবার এবং 'শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে' আশার অমোঘ প্রেরণা সঞ্চার করার জন্যে, তথাপি জীবনে আর কখনও তিনি এভাবে উন্মুক্ত আকাশতলে সমবেত বিক্ষুব্ধ জনচিত্তের প্রতিবাদকে ভাষা দেবার জন্যে এসে দাঁড়ান নি।

পরম নির্যাতনের মধ্যেও রাজবন্দীদের জীবনে এ একটা মস্ত বড় সান্ত্বনার বিষয় ছিল। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনেকের মধ্যেই একটা মতবিরোধ ছিল। উগ্র বামপন্থী বিপ্লবীদেব কারও কারও চোখে তিনি ছিলেন বুর্জোয়া শ্রেণীর 'পলায়নী-মনোবৃত্তি'র কবি। কেউ কেউ 'রাশিয়ার চিঠি'রও প্রতিকূল সমালোচনা করেছেন। তাঁকে কেন্দ্র ক'রে কারাগারের অভ্যন্তরে তুমুল তর্কযুদ্ধ বহুবার বহুস্থানে বহুরূপে প্রকটিত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে অগ্নিমন্ত্রের যে প্রেরণা পেয়েছি, ক্ষুরধার দুর্গম পথে চলবার যে অভয়বাণী শুনেছি, তার প্রভাব অনস্বীকার্য। চরমতম দুর্যোগের দুর্দিনেও কবিগুরু আমাদের অন্তরে আশার প্রদীপটি অনির্বাণ দীপ্তিতে প্রোজ্জ্বল ক'রে রেখেছিলেন। তাই বারবার মনে মনে তাঁবই ভাষায় তাঁর উদ্দেশে প্রেমনত চিত্তের কৃতজ্ঞতা নিবেদন ক'রে কৃতার্থ হয়েছি :

আজিকে গহন কালিমা লেগেছে গগনে, ওগো,
দিক্‌দিগন্ত ঢাকি।
আজিকে আমরা কাঁদিয়া শুধাই সঘনে, ওগো,
আমরা খাঁচার পাখি—
হৃদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর,
আজি কি আসিল প্রলয়-রাত্রি ঘোর।
চিরদিবসের আলোক গেল কি মুছিয়া।
চিরদিবসের আশ্বাস গেল ঘুচিয়া ?

দেবতার কৃপা আকাশের তলে
কোথা কিছু নাহি বাকি ?-
তোমা-পানে চাই, কাঁদিয়া শুধাই·
আমরা খাঁচার পাখি।

* * *

আজি দেখো ওই পূর্ব অচলে চাহিয়া, হোথা
কিছুই না যায় দেখা—
আজি কোনো দিকে তিমিরপ্রান্ত দাহিয়া, হোথা
পড়েনি সোনার রেখা।
হৃদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর,
আজি শৃঙ্খল বাজে অতি সুকঠোর।
আজি পিঞ্জর ভুলাবারে কিছু নাহিরে।
কার সন্ধান করি অন্তরে বাহিরে।
মরীচিকা লয়ে জুড়াব নয়ন,
আপনারে দিব ফাঁকি,
সে আলোটুকুও হারায়েছি আজি
আমরা খাঁচার পাখি।
ওগো, আমাদের এই ভয়াতুর বেদনা যেন
তোমারে না দেয় ব্যথা।
পিঞ্জরদ্বারে বসিয়া তুমিও কেঁদো না যেন
লয়ে বৃথা আকুলতা।
হৃদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর,
তোমার চরণে নাহি তো লৌহডোর।
সকল মেঘের ঊর্ধ্বে যাও গো উড়িয়া,
সেথা ঢালো তান বিমল শূন্য জুড়িয়া—
"নেবে নি, নেবে নি প্রভাতের রবি"
কহো আমাদের ডাকি।

মুদিয়া নয়ান শুনি সেই গান
আমরা খাঁচার পাখি।

মালিনী

দিন-বিশেক পব পূজো। কল্যাণীদি বললেন, 'আয় ভাই, আমবা সবাই মিলে 'মালিনী' অভিনয় করি।'

মেজদি 'ক্ষেমংকর' এবং নীনিদি (বনলতা দাশগুপ্তা : ডায়সেশন কলেজ হোস্টেলে রিভলভাব-প্রাপ্তি সম্পর্কে গ্রেপ্তার হয়ে পরে সংশোধিত ফৌজদাবি আইনেব কবলে প'ড়ে হিজলী বন্দিশালায় আবদ্ধ ছিলেন। ১৯৩৬ সালে অন্তবীণ অবস্থায় প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্‌ হাসপাতালে একটি অস্ত্রোপচারে মারা যান) 'সুপ্রিয়' হয়েছিলেন। আমি হয়েছিলাম 'মালিনী'। সুধাদি (শ্রীমতী ইন্দুসুধা ঘোষ : শান্তিনিকেতনের বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসুব প্রিয়ছাত্রী। ইনি 'স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার সম্পাদক 'ওযাটসনে'ব হত্যা-প্রচেষ্টাব অভিযোগে ধৃত হযে প্রমাণাভাবে মুক্তি পান, পবে সংশোধিত ফৌজদাবি আইনেব বিধান অনুযায়ী আটক ছিলেন হিজলী বন্দিশালায়) আমাদের সাজপোশাক করাচ্ছিলেন। দেখি, মেজদির মুখ ভাব। গালে হাত দিয়ে ব'সে আছেন ঘরের এককোণে। সবাই ভাল ভাল পোশাক পরছে আর উনি পরবেন সন্ন্যাসীর গেরুয়া। কল্পনাদির স্বভাবই ছিল প্রাচুর্য-ধর্মী। রিক্ততাকে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। সন্ন্যাসীর পোশাকে যে রিক্ততা ও বৈরাগ্যের ভাব আছে সেটাকে তিনি মনের মধ্যে গ্রহণ করতে পারছিলেন না। অভিনয়ের ভূমিকাকে আর বাস্তব-জীবনকে তিনি আলাদা ক'রে দেখেন না। তাই ত' মুস্কিল! ওটা ওঁর ছেলেমানুষী কল্পনা ক'রে সবাই খুব মজা করলেন।

কল্যাণীদি গম্ভীরকণ্ঠে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'এর পর আবার যখন আমরা অভিনয় ক'রব তখন তুমি নামবে কোন রাজপুত্র বা রাজকন্যার ভূমিকায়।'

অভিনয় শেষ হবার পর দেখা গেল, ক্ষেমংকরের ভূমিকায় মেজদি যে অভিনয় করেছিলেন তা সবচেয়ে বেশী উপভোগ্য।

আমাদের কারাজীবনে একাধিকবার আমরা সবাই মিলে অভিনয় করেছি। অভিনয় উপলক্ষে আমাদের মধ্যে যে উদ্দীপনা ও উৎসাহের সঞ্চার হ'ত তার মূল প্রেরণা ছিলেন কল্যাণীদি, সুধাদি, নীনিদি ও বীণাদি। সুধাদি ছিলেন জন্মশিল্পী। গুরুদেবের প্রভাবে শান্তিনিকেতনের আবহাওয়ায় মানুষ। বীণাদির ছিল সত্যিকারের কবি-মন। নীনিদির জীবনে ছিল উচ্ছলতা এবং কল্যাণীদির মনে ছিল সবাইকে খুশী রাখবার এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা। এই সবগুলোর সক্রিয় সমাবেশে আমাদের মিলিত জীবনটা আনন্দময় হয়ে উঠত।

কালের যাত্রা

সন্ধ্যা হতে না-হতেই বাইরে থেকে আমাদের দরজা বন্ধ ক'রে দেওয়া হত। আর খোলা হত সকালবেলা। এ হল জেলের 'লক্-আপ' প্রথা। রুদ্ধঘরে সন্ধ্যাবেলায় আমাদের দৈনন্দিন আলোচনা-সভা বসত। রাজনীতি, সমাজনীতি, কাব্য, সাহিত্য, বিজ্ঞান,—বাদ পড়ত না কিছুই। যে ক'টা বছর আমরা হিজলীতে ছিলাম সেই ক'টা বছরই ভারতবর্ষের তথা সমগ্র বিশ্বের রাজনৈতিক জীবনে বহু বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়ে গেছে। ভারতবর্ষে 'মুসলিম লীগ' শাখা-প্রশাখা বিস্তার করছে, কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙন ধরেছে, পাটনায় গান্ধীবিরোধীরা স্বতন্ত্র দল গঠন করলেন—'সমাজতন্ত্রী দল'। 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' সম্পর্কে কংগ্রেসের যে মনোভাব তার বিরুদ্ধ-

বাদীরা করলেন নতুন দল গঠন—'কংগ্রেস জাতীয় দল'। যুব-আন্দোলন, ছাত্র-আন্দোলন, সব-কিছুর মধ্যেই ধীরে ধীরে বিভিন্ন মতবাদের সংঘাত দেখা দিল।

ওদিকে ইউরোপে ফ্যাসিবাদের ব্যাপক অভ্যুত্থান শুরু হয়েছে। হিটলার-মুসোলিনীর রোমাঞ্চকর কাহিনী পড়ি। মুসোলিনী এক বিরাট জনসভায় মেঘমন্দ্রস্বরে বক্তৃতা করছেন, হাতে কাঁচের গেলাস। বোধ হয় বক্তৃতা দিতে দিতে জল খাচ্ছিলেন। নিজের নীতি ও কর্ম-পন্থা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রবল উত্তেজনায় কাঁচের গেলাস সজোরে ঠুকলেন অন্য হাতের তেলোয়। ভাঙা কাঁচের টুকরোয় হাত কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ে—মুসোলিনীর ভ্রূক্ষেপ নেই। সমগ্র জনতা সোল্লাসে চীৎকার ক'রে ওঠে। তাদের নেতার রক্তপাত নতুন উন্মাদনা জাগায় তাদের চিত্তে। ওদিকে হিণ্ডেনবার্গের আহ্বানে হিটলার জার্মানীর জনগণের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেছেন। পরাজিত জাতির হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করতে হবে—এই তাঁর পণ। রাশিয়ায় বৃটিশ ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে। ষড়যন্ত্রকারী ইংরেজদের বিচার চলছে মস্কোতে। একটি আসামী ভগবানের নাম নিয়ে কিছু বলতে গিয়ে বাধা পায়।

বিচারক কঠিনকণ্ঠে ব'লে ওঠেন, "The name of God has no power here". (এখানে ভগবানের নামের কোন শক্তি নেই)।

এই সমস্ত জাতির ভাগ্যনিয়ন্তাদের কথা কাগজে পড়ি আর ভাবি আমাদের জাতির উত্থান হবে কবে! যে জাতি পুরাতন আচার-বিচার ও অন্ধসংস্কার থেকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হয়ে বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টি নিয়ে মানুষের বিভিন্ন সমস্যাকে দেখবে! এখনও কি আবার কবিকে বলতে হবে,—

"সবাই জাগ্রত এ বিপুল ভবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়!"

একদিন সন্ধ্যাবেলা কাব্যগ্রন্থ নিয়ে আলোচনা চলছে। হঠাৎ প্রশ্ন করি, 'বীণাদি, জেল থেকে বেরিয়ে আমরা কি করব?'

মেজদি তখন কবির ভাষায় ব'লে উঠলেন, 'পুনর্বার তুলিয়া লইতে হবে কর্তব্যের ভার।'

বীণাদি আমার এই রকম প্রশ্ন শুনে একটু হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু মেজদির জবাব শুনে উৎসাহের সঙ্গে ব'লে উঠলেন, —'ভুলু Bravo!'

মেজদির জবাব শুনে আমার মনও খুশীতে ভ'রে উঠল। আমারই অন্তরের প্রতিধ্বনি যেন শুনতে পেলাম তাঁর কণ্ঠে।

সত্যি, কাজের অন্ত কোথায়? বলতে গেলে, সবে তো শুরু! যে সর্বাত্মক বিপ্লবের ভূমিকা রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে প্রমূর্ত হয়ে উঠছে তার বিরাট রূপের কথা ভাবতেও বিস্ময় লাগে। একজন দু'জন নয়, ভারত-সন্তানেরা যে কোটি কোটি! তাদের মধ্যে রাষ্ট্রচেতনার সঞ্চার করতে হবে, প্রবুদ্ধ করতে হবে দেশাত্মবোধে। শোষণমূলক শাসন-ব্যবস্থা কায়েম রাখার প্রয়োজনে বিদেশী প্রভুরা যে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেছেন—Divide and rule—তার কবল থেকে হিন্দু-মুসলমানকে কী ক'রে মুক্ত করা যায় সেই কথাও আমরা ভেবেছি। বারবার মনে হয়েছে এর পরিণাম জাতীয় জীবনকে বিষময় ক'রে তুলবে। তখন অবশ্য বুঝতে পারি নি যে, এই বিভেদ-সৃষ্টির শোচনীয় পরিণতি হিসেবে আমাদের পেতে হবে মাতৃভূমির দ্বিধাবিভক্ত রূপ, প্রত্যক্ষ করতে হবে সাম্প্রদায়িক হিংসার উন্মত্ততায় শিশুঘাতী নারীঘাতী আদিম বীভৎস বর্বরতা! কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের সাম্প্রদায়িক বিভেদনীতিই ত' জয়যুক্ত হলো! জানিনে কবে এই অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে ভারতবর্ষ আবার তার অসাম্প্রদায়িক ঐক্যের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

জেলে প্ল্যানচেট

মেজদি প্ল্যানচেট আনতে পারতেন। আমি নিজে বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু মেজদির বিশ্বাসকে অতিক্রম করতেও পারিনি। তার ফলে প্ল্যানচেট আনার কাজে আমিও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছি। গভীর রাত্রে জেল যখন নিস্তব্ধ, শুধু পাহারাদারদের জুতোর খটাখট শব্দ কানে যেত, তখন মেজদি, বীণাদি আর আমি বসতাম ওপারেব সঙ্গে এপারেব যোগসূত্র রচনা কবতে। প্ল্যানচেটে প্রীতিদি ও নির্মলদাকে ডাকা হত। (শ্রীনির্মল সেন: চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পলাতক আসামী। চট্টগ্রামের ধলঘাট গ্রামে পুলিশবাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নিহত হন।) একদিন নির্মলদাকে জিজ্ঞাসা করি, 'আমরা কতদিনে স্বাধীন হব?'

উত্তর পাই, 'It will take time.'

সত্যই তো, দেশ আজও স্বাধীন হয়নি। ইংবেজ ভারত ত্যাগ করেছে সত্যি, কিন্তু মনেপ্রাণে আমরা স্বাধীন মানুষ হব কবে? গান্ধীজীর আশঙ্কা ছিল, আত্মকলহই আমাদের সর্বনাশ করবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আশার বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, 'আত্মবিশ্বাস হারিও না, মন থেকে ভয় দূর কর, মৃত্যুর ভেতর দিয়ে অমর হও।'

বেঁচে থাকাটাই বড় কথা নয়। দেশের কিছু লোক যদি মরার মত মরতে পারে, ভীরুর মত, ক্লীবের মত বারবার ক'রে মরা নয়, বিপ্লবের তুঙ্গশিখরে আরোহণ ক'রে বজ্রের আলোতে 'মহান্ মৃত্যুর সাথে মুখোমুখি' হয়ে মরার সাধনা যদি তারা করতে পারে তবে তো দেশ আবার বেঁচে উঠবে!

মাসখানেক পরে হঠাৎ একদিন অফিসঘর থেকে মেজদির ডাক এল। সেই যে গেলেন, আর ফিরলেন না। খবর পাওয়া গেল,

তাঁকে বদলি ক'রে দেওয়া হয়েছে রাজসাহী জেলে। মাস্টারদার ফাঁসির হুকুম উপলক্ষ ক'রে ওখানকার বন্দীমহলে আলোড়নের সম্ভাবনা আশঙ্কা ক'রে এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল, এই আমাদের অনুমান। মেজদি চ'লে যাওয়াতে সকলের মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। তিনি সব সময়ই জেলখানাকে মাতিয়ে রাখতেন। তিনি ছিলেন প্রাণাবেগে ভবপুব। তাঁব সান্নিধ্য আমাদের রবীন্দ্রনাথের কবিতা স্মরণ করিয়ে দেয়:

দিক্‌বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দেব মত।

প্রশ্ন

আত্মীয়-প্রিয়জনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ কারাজীবনে এক গভীর কামনার বস্তু। সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই সাক্ষাৎকারের আনন্দলগ্নটি যখন আসে তখন সবার মধ্যে জাগে এক অপূর্ব চাঞ্চল্য। যার আত্মীয়স্বজন আসে শুধু তারই নয়, অন্য সবারও। আমাদের সঙ্গে যখন কেউ দেখা করতে আসতেন তখন অন্যান্য সবাই মিলে আমাদের সুন্দর ক'রে সাজিয়ে পাঠিয়ে দিতেন। এই সাজানোর ভিতর দিয়ে তাঁদের মনের যে বিশেষ পরিচয় পাওয়া যেত তাতে শুধু এই কথাই মনে হত, বাইরের বিপ্লবীজীবনের কঠোরতা নারীহৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলোকে নষ্ট করতে পারে নি। একদিন মা আমার ছোটবোন অমিতাকে সঙ্গে নিয়ে এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন আমার সোদরপ্রতিম শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। আমাকে সাজাতে আরম্ভ করলেন নীনিদি এবং সেই সাজানো শেষ হ'ল কল্যাণীদির নিপুণ হস্তে কুঙ্কুমের টিপ পরানোতে। আমাদের টিপ পরানোতে কল্যাণীদির এক বিশেষ সখ ছিল। কোন আপত্তিই

আমাদের টিকত না। বীণাদি' মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করতেন, কিন্তু কল্যাণীদির ইচ্ছাই শেষ পর্যন্ত পূর্ণ হত। পোশাক-পরা অর্থাৎ পোশাক পরানো শেষ হল। বাইরের জেলগেটে গিয়ে দাঁড়ালাম এক জালের বেড়ার কাছে। এধারে আমি, ওধারে মা, অমি আর ভূপেনদা। দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদীদের সাক্ষাৎকারের এই ছিল রীতি। মাঝখানের এই ব্যবধান যে কী দুঃসহ নিষ্ঠুরতা তা সাক্ষাৎকারের সময় প্রতিমুহূর্তে গভীর বেদনার সঙ্গে উপলব্ধি করতাম।

আমাকে দেখে মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোর দেহে এ বসন-ভূষণ যে!'

বললাম, 'ডেটিনিউরা সাজিয়েছেন তাঁদেরই পোশাক-পরিচ্ছদ আর অলঙ্কার দিয়ে।'

আর্তস্বরে মা বললেন, 'এ বেশ তো তোদের নয় রে! তোদের মূর্তি যে বুকে পাথরচাপা প্রহ্লাদের মূর্তি। সেই মূর্তিতেই তো তোদের দেখতে ভাল লাগে। আমার হরিই তো এই লৌহকপাট খুলে দিয়ে তোদের আবার আমার কাছে এনে দেবে।'

মার কথার কী-ই বা উত্তর দেব? সংশয়াকুল মনে প্রশ্ন জাগল—কোথায় তুমি প্রহ্লাদের হরি? লক্ষ লক্ষ নিরীহ ভারতবাসীর রক্ত শোষণ ক'রে প্রতিদিন বর্ধিত হচ্ছে ইংরেজ-সাম্রাজ্যবাদের কলেবর। তবু এর ধ্বংসের জন্য স্তম্ভ ভেদ ক'রে নৃসিংহ মূর্তিতে হরি তো আবির্ভূত হচ্ছেন না! সত্যিই কি হরি আছেন? সাধুর পরিত্রাণের জন্যে আর দুষ্কৃতকারীর বিনাশের জন্যে সত্যিই কি তিনি আবির্ভূত হন? সংশয়ে অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ওঠে। কোন জবাব পাইনে। ডস্টয়েভস্কির একটি উপন্যাসের নায়কের প্রশ্নই অনুরণিত হতে থাকে অন্তর্লোকে, "বিশ্বসৃষ্টির মূলে সত্যিই কি রয়েছেন সর্বশক্তির আধার সৃষ্টিকর্তা, না, তাঁর অস্তিত্ব মানুষের কল্পনাপ্রসূত? কত তর্ক করেছি, কত বিনিদ্র রজনীতে আবদ্ধ ঘরে পায়চারি ক'রে ভেবেছি 'দেবী, তুমি আছ, তুমি নাই।' কখনও বা মাঝরাতে বীণাদির মশারির মধ্যে ঢুকে তাঁকে জাগিয়ে বলেছি, 'বল বীণাদি, ভগবান নেই?'

শান্তকণ্ঠে বীণাদি জবাব দিয়েছেন, 'না ভাই, তা বলব না। *ভগবান আছেন কি নেই, জানিনে, তবে তাঁর নামে মনে শক্তি পাই আমি।'*

বীণাদির উত্তরে সংশয় ঘোচে না। বিক্ষুব্ধ চিত্ত বিক্ষুব্ধতর হয়ে ওঠে। গীতাখানা বার ক'রে তার ভেতর থেকে শ্রীকৃষ্ণের ছবি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলি। আপন মনে চীৎকার ক'রে বলি, 'মিথ্যা, মিথ্যা যত সব ঠাকুরের অস্তিত্ব।'

কল্যাণীদি দর্শনশাস্ত্রে এম-এ পড়তেন। তাঁর সঙ্গেও তর্কের বিরাম নেই। তিনি যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করতেন, ভগবান আছেন। প্রত্যয় জাগে না মনে। বাইবেলের 'বুক অব জবে'র সেই প্রশ্নই আমার মনে নিত্য নূতন ভাবে জাগত, যদি সত্যিই ভগবান থাকেন পৃথিবীতে এত অত্যাচার এত অবিচার, কেন পুণ্যবান ও নিরীহের এত দুঃখ এবং অত্যাচারী ও পাপীর গর্বোন্নত শির আর পার্থিব সমৃদ্ধি ?

কমলাদির সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা ক'রে তুলনায় শান্তি পেতাম। কারণ তাঁর ও আমার মনের জিজ্ঞাসার মধ্যে ছিল স্বাজাত্য। মনের এই বিশেষ অবস্থায় পড়লাম Humanity Uprooted বইখানা। নূতন আলো যেন দেখতে পেলাম। অর্থহীন, যুক্তিহীন, সংস্কার ও ধর্মের অন্ধ গোঁড়ামিকে প্রতিহত ক'রে যুক্তিবাদী মনের বিবর্তন আমাদের যেন এক নূতন পথের ইঙ্গিত এনে দিল।

মা আমাদের জন্য সঙ্গে ক'রে এনেছিলেন, অনেকগুলো নূতন গুড়ের সন্দেশ, অনেকখানি কমলালেবুর পায়েস আর কিছু কমলালেবু। ওগুলোর কী ক'রে সদ্ব্যবহার করা যায়, এ নিয়ে পরামর্শ চলল

বীণাদি আর পুঁটুদির সঙ্গে। খাওয়ার জিনিষ নিছক ভোজ্যবস্তু হিসেবে খেতে আনন্দ পাওয়া যায় না। তাই প্রয়োজন একটা উপলক্ষ সৃষ্টির—যাকে আশ্রয় ক'রে খাওয়াটা আনন্দের উপকরণ হয়ে উঠবে। ব্যবস্থা হল প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলার। বিচারকেরা বসলেন, পুরস্কার ঘোষণা হল, তারপর হৈ-হল্লা ক'রে খাওয়া হল। এমনি ক'রে ছোটখাট জিনিষকে কেন্দ্র ক'রেও এক একটা উৎসবের সৃষ্টি হত; প্রকাশ পেত আমাদের প্রাণোচ্ছলতা। একঘেয়ে পরিবেশের মধ্যেও বৈচিত্র্যের সঞ্চার ক'রে চলেছি আমরা এবং এতেই প্রমাণ হত জীবন আমাদের ফুরিয়ে যায়নি।

ঋতুচক্র

বন্দিশালায় ঋতুপরিবর্তনের চেহারাটি বড় স্পষ্ট হয়ে উঠত। বাইরের জগতে যখন প্রকৃতির সঙ্গে এক হয়ে থাকি তখন চিরজীবনের এই সঙ্গিনীকে বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করার কথা যেন মনেই পড়ে না। কিন্তু বন্দিশালায় উচ্চ প্রাচীরের অবরোধ থেকে মুক্ত প্রকৃতির স্পর্শ একটুতেই মনকে গভীরভাবে দোলা দেয়।

আকাশে হেমন্তের হাত ধ'রে শীতের আবির্ভাব বিঘোষিত হয়েছে। "শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন আমলকির এই ডালে ডালে'—মনের মধ্যে বার বার এই গানের সুরটি গুঞ্জন ক'রে ফিরছে। বড় ভাল লাগে। বিশেষ ক'রে—

"শূন্য ক'রে ভরে দেওয়াই যাহার খেলা
তারই লাগি রইনু ব'সে সকালবেলা॥
শীতের পরশ থেকে থেকে যায় বুঝি ওই ডেকে ডেকে
সব খোয়াবার সময় আমার হবে কখন কোন্ সকালে।"

হেমন্ত আমার সবচেয়ে প্রিয় ঋতু। ভোরবেলাকার ঝিরঝিরে উত্তুরে হাওয়া, শিশির-ভেজা ঘাসের ওপর খালি পায়ে ছোটা, প্রথম সূর্যের দিকে পিঠ ফিরিয়ে ব'সে বই পড়া—এই সব আমার কী যে আনন্দের ছিল, তা স্মরণ করলে এখনও মনে জাগে এক মধুর অনুভূতি। এই ঋতু নিয়ে বীণাদির সঙ্গে আমার তর্ক চলত। বীণাদি বলতেন, শরৎ-ই ঋতুর রাজা। বিশেষ ক'রে বাঙলা দেশে শরৎকাল উপভোগ্য।

এই শরতের বর্ণনাতেই বাঙলা দেশের কবিরা মুখর হয়ে উঠেছেন, এই শরৎকালেই রামচন্দ্র আরাধনা করেছেন শক্তিরূপিণী দুর্গার রাক্ষস-নিধনে তাঁর বরাভয় প্রার্থনা ক'রে। বীণাদি তাঁর বাবার কথাগুলোই আবৃত্তি ক'রে যেতেন। বাঙলা দেশের শরৎকালে দুর্গাপূজোর ভেতর দিয়ে চলে মায়েব আহ্বান তাঁর কন্যাকে। কন্যার প্রতি মাতৃস্নেহের এমন প্রকাশ অন্য কোন দেশে নেই। তর্কে নিরূপিত হত না ঋতুবিশেষের প্রাধান্য। বীণাদি শেষ পর্যন্ত মন্তব্য ক'রে বসতেন—'হেমন্তকাল তোমার জন্মঋতু, তাই ওটা তোমার এত প্রিয়।'

মায়ামালঞ্চ

আমাদের ওয়ার্ড থেকে একটুখানি দূরে সুধাদির নিজের জন্যে একখানা ঘর ছিল। ঘরখানা আয়তনে ছোট—কলকাতার মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্যে তৈরি ফ্ল্যাটের স্নানের ঘরের মতই। ছোট্ট ছোট্ট জানলা, দরজায় কপাট নেই। রোদ ও বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবার জন্যে ক্যাম্বিশের পর্দা ঝোলানো ছিল জানলা-দরজায়। সুধাদির স্বহস্ত রোপিত কুঞ্জলতা, সন্ধ্যামালতী জানলা বেয়ে ছাদ পর্যন্ত উঠেছিল। ঘরখানার তিনদিকে সারি সারি ফুলের গাছ। অজস্র গাঁদাফুল ফুটে রয়েছে। এই বাগানের গাছের জন্যে সুধাদির কী মমতা! নিজের হাতে যত্ন করেন। ফোটা ফুলের দিকে তাকিয়ে ছবি আঁকেন। কখনও বা মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। কিন্তু একটি ফুলও গাছ

থেকে ছিঁড়তে পারেন না, এমনি কোমল, সত্যিকারের শিল্পিমন ছিল সুধাদির। 'আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর'—বিশ্বের রাজরাজেশ্বরীর কাছে এই হল চিরন্তন প্রার্থনা শিল্পিমনের। আর কিছুতেই কোন লোভ নেই, নেই কোন প্রত্যাশা। অথচ এই সুধাদি এমনিতর কবিত্বময় পরিবেশের মধ্যে তাঁব ঘরে ব'সে অনেকদিন মার্কস্‌বাদের আলোচনায় ব্যস্ত থাকতেন। ছবি, গান, কোনটাই তাঁকে রাজনীতিক তত্ত্বজিজ্ঞাসার শুষ্কতা থেকে টেনে আনতে পারত না। দু'টো পরস্পরবিরোধী স্বভাবের এক বিচিত্র সমন্বয় দেখেছি সুধাদির মধ্যে। হয়ত এই কোমলে-কঠোবে এই রুদ্রে-মধুরে— বাঙলার প্রত্যেক বিপ্লবিনীরই হৃদয় তৈরি ছিল।

প্রকম্পিতা মেদিনী

১৯৩৪ সালেব ১৫ই জানুয়াবী দুপুবে সুধাদিব ঘরটিতে ব'সে আমরা বিভিন্ন রাজনীতিক মতবাদ নিয়ে তর্কমুখর হয়ে উঠেছি। এমন সময় শুনতে পেলাম, বাইরে ভীষণ এক কোলাহল। সবাই ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ছে। আমাদেরও পায়ের তলায় মাটি যেন কাঁপছে। বুঝলাম, ভূমিকম্প। কিন্তু সে মুহূর্তে একথা কল্পনা করতেও পারিনি যে, যা আমাদের পায়ের তলাকার মাটিকে একটুখানি দোলা দিয়ে গেল তা অন্য একটা প্রদেশের একটা প্রকাণ্ড অংশকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত ক'রে গেছে।

বিহারের এই অভূতপূর্ব প্রাকৃতিক বিপর্যয়েব উল্লেখ ক'রে গান্ধীজী বলেছিলেন,—'মাতা বসুন্ধরা পাপের বোঝা বইতে না পারাতেই এই ভূমিকম্প।'

আমাদের সবার মন বিজ্ঞানপন্থী, তত্ত্বজিজ্ঞাসু। গান্ধীজীর প্রতি আমাদের বিরুদ্ধ-সমালোচনাকে তীব্রতর ক'রে তুলল

মাত্র। গান্ধীবাদে আমরা কখনই বিশ্বাস করিনি, বিপ্লববাদের প্রসারের জন্যে গান্ধীজী পরিচালিত গণ-আন্দোলনের সুযোগ অবশ্য আমরা গ্রহণ করেছি। সুতরাং জীবন ও ঘটনা সম্পর্কে গান্ধীজীর ভাষ্যকে উপহাসও করেছি। বিহার-ভূমিকম্পের কারণ সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য করলেন সেটা আমাদের মধ্যে শুধু বিদ্রূপাত্মক আলোচনার খোরাক সৃষ্টি করল মাত্র। বিপর্যস্ত বিহার যখন বিংশতি সহস্র মৃতদেহ বক্ষে ধারণ ক'রে ত্রাহি ত্রাহি চীৎকার করছে তখন বিহারের শ্রেষ্ঠ সন্তান ডাক্তাব রাজেন্দ্রপ্রসাদ কারান্তরালে ব'সে আকুল আবেদন জানালেন সরকারেব কাছে, বিহারেব এই চরমতম দুর্দিনে দুর্গত বিহারবাসীদের পাশে এসে তাঁকে দাঁড়াবার সুযোগ দেবার জন্যে।

বিহার-দুর্গতি-ত্রাণের জন্যে সমগ্র ভারতে যে বিপুল সাড়া পড়ে গেল, তার সংবাদ আমরা সংবাদপত্রে পড়তাম আর ভাবতাম মানবতার সেবাকার্যে নিজেদের নিয়োজিত করার সামান্য সুযোগও আজ আমাদের নেই। এই অসহায় ভাব নিজেদের মনকে পীড়িত ক'রে তুলত।

তাসের আড্ডা

সমগ্র পরিবেশটা সিন্ধবাদের দৈত্যের মতই আমাদের মনের ওপর চেপে বসত, কিছুতেই সোয়াস্তি পেতাম না। কর্মহীন জীবনযাত্রার দুঃসহতা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে ডেটিনিউদের ভাতা থেকে কয়েক জোড়া তাস আনান হল। এই তাস-চক্রে অন্তর্ভুক্ত হলাম নীনিদি, বীণাদি, সুধাদি, কমলাদি, পুঁটুদি ও আমি। কল্যাণীদিও মাঝে মাঝে যোগ দিতেন। কিন্তু তাসে আসক্তি তাঁর ছিল না। আমাদের কিন্তু ঠিক তার উলটো। আমাদের প্রত্যেক কাজেই ছিল একটা উদ্দামতা,

একটা উচ্ছলতা ; যা' একবার ধরি, তার মধ্যে আর গণ্ডি টানতে পারিনে।

তাই একদিন কল্যাণীদিকে গম্ভীরভাবে শাসাতে হল, 'মনু, কোন জিনিষেরই নেশা ভাল নয়।'

বুঝলাম, আমাদের বাড়াবাড়ি দেখে তিনি কষ্ট হয়েছেন। তাঁকে এটা আমরা বোঝাতে পারিনি যে সাময়িকভাবে তাসের মধ্যে ডুব দিয়ে মন ভুলাবার রসদ খুঁজলেও নিজেদের আদর্শ থেকে কখনও আমরা বিচ্যুত হইনি। অবসর বিনোদনের যা উপায় তা যদি লক্ষ্যের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছুতে চায় তাহলে সেটাই হয়ে ওঠে নেশাখোরের অধোগতি। মনের যে অবস্থায় আত্মহত্যাকে কাম্য ব'লে মনে হত সেই অবস্থায় নিজেদের ভুলিয়ে রাখবার জন্যে যদি আমরা তাসের আশ্রয় নিয়ে থাকি তাতে কি-ই বা অন্যায় করেছি? নীতিবাগীশ কল্যাণীদিকে এসব কথা বোঝাতে যাওয়াও বিড়ম্বনা! তাঁর কাছে আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা হারালে চলবে না! চলবে না আচরণের বিন্দুমাত্র শৈথিল্য! স্খলন পতন ত্রুটি—কোনদিনই ক্ষমার্হ নয়।

'এপ্রিল ফুল'

এপ্রিল মাস। সুধাদির উদ্‌ভাবনী শক্তি এ মাসের পয়লা দিনটিতেও সক্রিয় হয়ে উঠবে, এটা জানতেন বলেই পুঁটুদি আগের রাতে আমাদের সাবধান ক'রে দিয়ে গিয়েছিলেন। এর আগের বছর তিনি ময়দা ও রং দিয়ে একটা মস্ত বড় সাপ তৈরী ক'রে ওঁদের প্রকাণ্ড হলঘরের দরজার সামনে রেখে দেন। অনেকে লক-আপের আগেই ঘরে ঢুকে পড়তেন। আর সবাই ঢুকলে জমাদার-জমাদারনীরা দরজা বন্ধ ক'রে

দিত। ঢুকতে গিয়েই ওই সাপটি দেখে ইন্দুদির (ইন্দুমতী সিংহ) সে কী চীৎকার!

জমাদারনী ছুটে গেল ডেপুটি-জেলারকে খবর দিতে। ডেটিনিউরা 'সাপ' 'সাপ' ব'লে চীৎকার করছে; জমাদার লাঠি খুঁজে পাচ্ছে না। এদিকে সাপটা নড়েও না, চড়েও না। তখন সবাই ভাবলে, সাপটা বোধ হয় খোলস বদলাচ্ছে। ইন্দুদি তো রেগেই অস্থির। হিন্দীভাষাতেই জমাদারদের তাড়া দিচ্ছেন সাপটা মারবার জন্যে। এর আগেই তিনি লাফ দিয়ে খাটের ওপর উঠে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। সেখান থেকে এগিয়ে দিলেন মশারির লোহার ডাণ্ডা, কিন্তু নিজে নীচে নামলেন না। তারপর যখন জমাদার বীরদর্পে বহু সন্তর্পণে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে মশারির ডাণ্ডা দিয়ে সাপটার ওপর আঘাত হানতে লাগল, তখন সুধাদি হাসতে হাসতে বললেন, 'থাক, হয়েছে, আর বীরত্বে কাজ নেই; সবাই 'এপ্রিল-ফুল' হলে।'

এবারও তাই সবাই তটস্থ হয়ে আছেন। কী যে করবেন সুধাদি, কে জানে! লক-আপের অনেক পরে ছুটতে ছুটতে সুধাদি এলেন একটা বাটিতে রাবড়ি জাতীয় পদার্থ ও চামচে নিয়ে। সুধাদি খুব ভাল খাবার করতে পারতেন। এসেই বললেন, 'আজকে নতুন ধরনের রাবড়ি করেছি। সবাই বলছে, বেশ ভাল হয়েছে। তোদের তাই নিজের হাতে খাওয়াতে এলাম।'

লক-আপ হয়ে গেছে। কাজেই আমরা ঘরের ভেতরে রয়েছি, উনি ঘরের বাইরে। লোহার গরাদের ভেতর দিয়ে বাবড়ি তুলে দিলেন উনি বীণাদির হাতে। বীণাদি মুখে দিয়েই থু-থু ক'রে ফেলে দিলেন। বুঝলেন যে তিনি এপ্রিল ফুল হয়েছেন।

ডেটিনিউ মহলেও অনেকে তাঁর রাবড়ি খেয়েছিলেন। যাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন তাঁরা খাননি। খেলেও 'ফুল', না খেলেও 'ফুল'। সুধাদির পয়লা এপ্রিলের রাবড়ি অনেকেরই বহুদিন মনে থাকবে।

বর্ষামঙ্গল

দেখতে দেখতে গ্রীষ্মের প্রখর তপনতপ্ত দিনগুলোর অবসান হ'ল। সামনেই বর্ষা। পয়লা আষাঢ় 'বর্ষামঙ্গল' করতে হবে—নাত্বদি প্রস্তাব করলেন। আমরা উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম সকলে। গান শেখাবার ভার পড়লো সুধাদি'র ওপর। রবীন্দ্র-সংগীত সবই তাঁর জানা। শান্তিনিকেতনের ছাত্রী হিসাবে শিল্পে আর সংগীতে তাঁর ভাণ্ডার ছিল চিরপূর্ণ। দিন-রাত গানের মহড়া চল্‌তে লাগল। এসে পড়ল প্রতীক্ষিত পয়লা আষাঢ়। কাজের অন্ত নেই। শাড়ি রঙ করা হ'ল। সবাই পরবে একই রঙের শাড়ি। সুধাদি একফাঁকে রবীন্দ্রনাথের একটা গল্প শোনালেন, 'জানো শান্তি, গ্রীষ্মের পর যখন বর্ষা নামতো তখন গুরুদেব তাঁর পোশাকেরও আমূল পরিবর্তন করতেন। কালো ভেল্‌ভেটের আল্‌খাল্লা, পিঠে জরির কাজ। সে পোশাকে এত সুন্দর লাগতো গুরুদেবকে!'

ডেটিনিউদের হাতখরচের পয়সা থেকে এলো অজস্র ফুল, কদম, বেল, যুঁই, গন্ধরাজ। আর এলো রাশি রাশি দেবদারু পাতা। সুধাদি নিজের হাতেই সাজালেন ডেটিনিউদের শোবার ঘরের একটা অংশ। প্রথমেই বর্ষার আগমনকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বাণী পাঠ করা হ'ল। লিখেছিলেন বীণাদি। তারপরে সমবেত সংগীত গাওয়া হ'ল। প্রথম গাওয়া হ'ল, 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলো ভাঙ্গল ঝড়ে', তারপরে গাওয়া হ'ল 'তপের তাপের বাঁধন কাটুক রসের বর্ষণে।' এমনি পর-পর চলল গানের মালা। গ্রীষ্মান্তক নববর্ষার উদ্দেশে তৃষ্ণার্ত হৃদয়ের গীতিপুষ্পাঞ্জলি। সমগ্র অনুষ্ঠানটি হয়েছিল অতি মনোরম। পরিচালনা করেছিলেন সুধাদি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত।

তপতী

বর্ষার পরে সামনে আস্‌ছে শরৎ। রৌদ্র আর বৃষ্টির খেলা চল্‌ছে হিজলীর আকাশে-বাতাসে; এবারের পূজোয় কী আমরা কোরব এ' নিয়ে চললো জল্পনা-কল্পনা। কল্যাণীদির প্রস্তাব, একটা অভিনয় করতে হবে। বই বাছতে গেল দু'দিন। শেষে স্থির হ'ল রবীন্দ্রনাথের 'তপতী' হবে। রাজা হলেন নীনিদি, সুমিত্রা হলাম আমি, বিপাশা হলেন হেলেন বল, নরেশ হলো প্রতিভা ভদ্র, আর দেবদত্ত হল উষা মুখার্জি। রোজই বিকেলে মহড়া চলতে লাগল। রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে যখন কলকাতায় 'তপতী'র প্রথম অভিনয় হয় তখন সুধাদিও ছিলেন নন্দলাল বসুর সঙ্গে শিল্পী হিসাবে। কাজেই এবারও পরিচালনার সমস্ত ভার নিতে হল সুধাদিকে। আমাকে শেখাবার ভার নিলেন বীণাদি নিজে, রোজ রাত্রে বীণাদি আমাকে শেখান। কিন্তু তাঁর কিছুতেই পছন্দ হয় না আমার সেই জায়গাটির আবৃত্তি যেখানে সুমিত্রা মহারাজকে বলছেন, 'সিংহাসন থেকে তুমি নেমে এসেছো এই নারীর কাছে, আমাকে কেন তুমি নিয়ে যাও না তোমার সিংহাসনের পাশে?'

বীণাদি বললেন, 'শান্তি, তুমি শুধু আবৃত্তি ক'রে যাচ্ছ, এর মধ্যে প্রাণ নেই। ভুলে যাও তুমি 'শান্তি,' নিজেকে মনে কর 'সুমিত্রা'—জালন্ধর রাজমহিষী। তোমার রাজাকে তুমি তোমার মনের মত ক'রে পাচ্ছ না। জালন্ধরের প্রজাবৃন্দের জন্যে তোমার অন্তরে উদ্বেগ জেগে উঠুক। সেই আবেগ যদি তুমি না জাগাতে পার মনের মধ্যে, তা'হলে ত' তুমি পারবে না কথার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করতে।'

শেষ পর্যন্ত বীণাদির চেষ্টা জয়ী হ'ল—আমার জড়তা কাট্‌ল। এখন মুস্কিল হ'ল গান নিয়ে। হেলেন বিপাশা সেজেছে।

কাজেই গান সব ওরই গাইবার কথা। কিন্তু অনেকে বললেন, 'তা হবে না, শান্তিকেও গান গাইতে হবে।'

শেষ পর্যন্ত স্থির হলো, বিপাশার শেষ দু'টো গান— যখন সুমিত্রা অগ্নিতে আত্মাহুতি দিতে যাচ্ছেন তখনকার গান—'জাগো, আলস-শয়ন-বিলগ্ন' এবং 'শুভ্র নব-শঙ্খ তব গগন ভরি বাজে'—ঐ দু'টো গান আমিই গাইব।

পূজোর দু'দিন আগেই হবে অভিনয়। এদিকে বীণাদির ডান-হাতের কনুইয়ে একটা মস্ত ফোঁড়া হয়ে সব বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম। কিন্তু জেলের ডাক্তার ডাঃ ভগৎ এগিয়ে এলেন, বললেন, 'ঐ ফোঁড়া অস্ত্রোপচার ক'রে সারিয়ে দেব আপনাদের অভিনয়ের আগেই।'

সারালেনও। কিন্তু একটি দল আপত্তি তুললেন, 'যদি জেলের কর্মচারীদের নিমন্ত্রণ করা হয় তবে তাঁরা ঐ আনন্দোৎসবে যোগ দেবেন না।'

সব পরিশ্রম বুঝি ব্যর্থ হয়! সবাই সানন্দে যোগ না দিলে উৎসবের আনন্দটুকু নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া এঁরা যদি যোগ না দেন তবে হেলেনকেও পাওয়া যাবে না, অথচ হেলেন হচ্ছে বিপাশা —নাটকের অন্যতম মুখ্য চরিত্র। শেষ পর্যন্ত একটা আপোষ করা হ'ল। ডেপুটি-জেলার ছাড়া আর কাউকেই নিমন্ত্রণ করা হ'ল না। অভিনয় উৎসব শেষ হ'ল নিখুঁতভাবে। সবারই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন করলাম আমরা।

'পলায়ন-প্রচেষ্টা'

অনেক যুক্তি-তর্ক আলাপ-আলোচনার পর স্থির হ'ল, জেলের মধ্যে সমস্ত জীবন তিলে তিলে অকারণে ক্ষয় না ক'রে আমরা জেল থেকে পালিয়ে গিয়ে আবার কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ব। এও

স্থির হল, নীনিদি (বনলতা দাশগুপ্তা), নাত্নুদি' (কমলা চ্যাটার্জি) ও আমিই পলায়নী অভিযানের প্রথম পর্ব রচনা করব। সুন্দরী নাম্নী এক জমাদারনীর কাছ থেকে সহায়তার আশ্বাস পাওয়া গেল। অর্থ-সংগ্রহের প্রয়োজনে আমাদের এই প্রস্তাব ডেটিনিউদের অনেককে জানাতে হ'ল। আমাদের মধ্যে অভূতপূর্ব উত্তেজনা। আমাদের কথা-বার্তা চলা-ফেরার মধ্যে চাঞ্চল্য প্রকাশ পেতে লাগল। কী ক'রে জানিনে আমাদের কার্যসিদ্ধির আগেই আমাদের উদ্দেশ্য কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত হ'ল। ফলে, বলাই বাহুল্য, আমাদের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেল। ভগ্নহৃদয়ে গতানুগতিকভাবে জীবন চালিয়ে যেতে লাগলাম। একদিন 'স্টেট্স্‌ম্যান' কাগজে দেখলাম, আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল থেকে পালিয়েছেন পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত ও সীতানাথ দে। এ খবর পাওয়ার পরে আমাদের ব্যর্থতার বেদনা দ্বিগুণ হয়ে উঠল। ভবিষ্যতের জন্যে অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টা না ক'রে যদি আমরা তাড়াতাড়ি পালিয়ে যেতে পারতাম তবে আমরাও তো এঁদের মতোই রূপ দিতে পারতাম আমাদের পরিকল্পনাকে। দলগত বিভেদ সত্ত্বেও আদর্শের দিক দিয়ে আমাদের মধ্যে ছিল পরম ঐক্য। আমরা সকল দলই ছিলাম বিপ্লববাদে বিশ্বাসী, এই আদর্শমূলক ঐক্য দলগত বিভেদের চেয়ে অনেক বড়। তাই তো সেই মুহূর্তে অনুভব করলাম, ওঁরা দু'জনে ভিন্ন দলের হলেও ওঁরা যেন আমাদের একপথের পথিক। তাঁরা দু'জনে চললেন সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে সার্থকতার পথে; আর আমরা প'ড়ে রইলাম পিছনে ব্যর্থতার বোঝা মাথায় নিয়ে। জেল থেকে আমাদের পালাবার সংকল্পের কথা কর্তৃপক্ষের কানে যেতেই জমাদারনীর সংখ্যা হ'ল দ্বিগুণ। পাহারাওয়ালাদের জুতোর নীচের লোহার খট্‌-খট্‌ শব্দ নিশীথ রাত্রির স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করতে লাগল। এইসব দেখি আর আমরা মনে মনে হাসি। আবৃত্তি করতে থাকি,—'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে মোদের বাঁধন টুটবে।'

পাহারাওয়ালার সজাগ পাহারা, প্রাচীরের দুর্লঙ্ঘ্যতা কিছুই কি

ব্যাহত করতে পেরেছিল পূর্ণানন্দ আর সীতানাথের প্রয়াসকে ? কর্মের সফলতা যখন আসে তখন সেটা সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম ক'রেই আসে ; আবার ব্যর্থতা যখন আসে তখন তা' আসে সামান্যতম কারণকে আশ্রয় ক'রে। নতুন আমদানি-করা জমাদারনীদের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বিদ্রূপের হাসি হাসতাম, আর ভাবতাম, 'এরাই রুধবে আমাদের জয়-যাত্রার পথ ?'

পলায়ন-প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হ'ল। সমগ্র কারাগার সচকিত। আমরা নিতান্ত ভালমানুষের মত বিভিন্ন খেয়ালে মেতে গেলাম। আমি গান শিখি সুধাদির কাছে। নীনিদি বীণাদি বারান্দায় ব'সে পাল্লা দেয়, কে কতক্ষণ শ্বাসরুদ্ধ ক'রে থাকতে পারে? চোখের পলক না ফেলে কে কতক্ষণ অন্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে তারও মহড়া চলে। এই রকম বহু খেয়ালের মধ্যে ডুবে আছি আমরা। একদিন দেখলাম স্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজখানার দেহ ক্ষত-বিক্ষত। তার পরের দিনও তাই। ডেপুটি-জেলার কৈফিয়ৎ দেন, উচ্চতর কর্তৃপক্ষের হুকুমে কাগজের অংশবিশেষ বাদ দিয়ে পাঠাতে হয় ভেতরে। যাবার সময় জানিয়ে গেলেন—দার্জিলিঙের ঘোড়দৌড়ের মাঠে বাঙলার লাট এণ্ডারসন্‌কে হত্যা করার চেষ্টার অপরাধে অমিয়া মজুমদার প্রমুখের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছে।

দলগত বিরোধ

মাঝে মাঝে স্থানান্তরিত সঙ্গিনীদের জন্যে মন উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় ভ'রে উঠত। তাঁদের তুচ্ছতম সংবাদও গভীর আগ্রহের সঞ্চার করত আমাদের মধ্যে। সুনীতি, কল্পনাদি, জ্যোতিদি, (জ্যোতিকণা দত্ত—ডায়োসেশন কলেজ হোস্টেলে রিভলভার-প্রাপ্তি সম্পর্কে ধৃত হন),

মাসীমা (সাবিত্রী দেবী)—এঁরা সব রয়েছেন রাজসাহীতে। সেখানে থেকে ওঁদের কোন খবরই আমরা পেতাম না। নির্মলার (চট্টগ্রামের রাজনৈতিক বন্দিনী শ্রীমতী নির্মলা চক্রবর্তী) দণ্ডকাল উত্তীর্ণ হওয়ার পরে রাজসাহী জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সংশোধিত ফৌজদারি দণ্ডবিধির আওতায় প'ড়ে আবার হিজলীতে এসে আশ্রয় নিয়েছে। তার কাছ থেকে রাজসাহী জেলের অনেক খবর পেলাম। সবচেয়ে বেদনার খবর হল, রাজসাহী জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে দলগত বিবাদ-বিসম্বাদের আতিশয্য। ক্ষুদ্র দলগত স্বার্থ শুধু যে আমাদের আদর্শচ্যুত করে তা নয়, ওর দ্বারা মানুষ হিসেবেও আমরা অধঃপতিত হই। বাঙলা দেশের যে-সব তরুণের দল দেশের স্বাধীনতার জন্যে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়েছেন তাঁদের মধ্যেও যখন দেখি দলগত স্বার্থের ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতা তখন মন পীড়িত হয়ে ওঠে। বিশেষ কোন রাজনীতিক মতবাদকে কেন্দ্র ক'রে যখন দল গড়ে ওঠে, তখন সেই দলের প্রতিষ্ঠার জন্যে ও তাদের আদর্শের বহুল প্রচারের জন্যে সচেষ্ট হওয়া দলের প্রত্যেকটি সভ্যেরই কর্তব্য—স্বীকার করি। কিন্তু সেই কর্তব্য-বোধ যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ক্ষুদ্রতায় ও হীনতায় পর্যবসিত হয় তবে সেটাকে আর সমর্থন করা যায় না। দলগত রেষারেষি এবং ব্যক্তিগত অসূয়া-বিদ্বেষকে কেন্দ্র ক'রে রাজসাহী জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে যে-সব কুশ্রী ঘটনা ঘটে গেছে তাতে আমরা লজ্জা বোধ করেছি। বার বার মনে প্রশ্ন জেগেছে, কেন এমন হয় ?

ফাঁসির মঞ্চে

মাস্টারদা ও তারেকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসি হয়ে গেছে। জেলে ব'সে শুনেছি, ফাঁসিমঞ্চে আরোহণ করাব পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত ইংবেজ শাসকদের অনুচরেরা তাঁদের প্রতি অসৌজন্য প্রকাশ কবেছে। এই সব ঘৃণিত পরপদলেহীদের দল কি কল্পনাও করতে পাবে যে, এ সকল মৃত্যুঞ্জয়ী বীরদের মন যে অবস্থায় আছে সেখানে এদেব দুর্ব্যবহাব আব অমানুষিকতা পৌঁছতে পারে না। 'আপনাতে আপনি অটল মূর্তি' এই সব বীরের দল নিন্দা-প্রশংসা-অত্যাচাব-নিপীড়নেব বহু উর্ধ্বে নিজেদের আত্মাকে উত্তোলিত করেছেন।

এর পরে একদিন খবব এল, দিনেশ মজুমদারেবও ফাঁসি হয়ে গেছে। পরিচিতদের মধ্য থেকে এভাবে বহু উজ্জ্বল তাবকা খ'সে পড়ল। বক্তবিপ্লবের বাণী যাঁরা বহন ক'বে চলেছেন তাঁদের অনেকের বক্তে রঞ্জিত হল বাঙলার শ্যামল মৃত্তিকা। হৃদয় ভেঙে পড়তে চায়, তবু সবই সহ্য ক'বে যেতে হবে। তাঁদের এই পরিণামের জন্যে আমাদের তো তাঁরা প্রস্তুত ক'বেই রেখেছিলেন। কবিগুরুর জিজ্ঞাসা প্রতিধ্বনিত হতে থাকে মনের মধ্যে—

বীরের এ রক্তস্রোত মাতার এ অশ্রুধাবা
এর যত মূল্য, সে কি ধবার ধূলায় হবে হাবা ?
স্বর্গ কি হবে না কেনা ?
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না এত ঋণ ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন ?

বাইরের হাওয়া

ইংরেজ সরকারের খাস অতিথি যাঁরা তাঁদের প্রতি সৌজন্য ও সুবিচারের খোলসটা ছিল পাকাপোক্ত। তাঁদের পারিবারিক ভাতার ব্যবস্থা, ব্যক্তিগত ভাতা, চিকিৎসার ব্যবস্থা, মুমূর্ষু নিকট-আত্মীয়কে দেখতে যাবার ছুটি মঞ্জুর করা প্রভৃতি সভ্যজন-সুলভ ন্যায়বিচারের পরিচয় এঁরা যে দেন নি, তা নয়। বিনা বিচারে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে কয়েদখানায় পূরে রাখার মত এক চরম অন্যায়কে এই সামান্য ন্যায়পরায়ণতা দিয়ে ঢেকে রাখার এটা যে বিশুদ্ধ ছলমাত্র তা অবশ্য সবাই জানত। তবু ন্যায়পরায়ণতার অলিগলি বেয়ে মাঝে মাঝে রাজবন্দীদের মধ্যে কেউ কেউ মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতালে গিয়ে পৌঁছতেন। সেখান থেকে বহির্জগতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা ছিল সহজসাধ্য। কমলাদি এবার গেলেন প্রেসিডেন্সি জেলে, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অসুস্থ পিতাকে দেখবার সুযোগ পাবার জন্যে। তাঁর বাবার দেহে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়েছিল। কাজেই বেশ কিছুদিন রোজই ঘণ্টাখানেক ক'রে মেডিক্যাল কলেজে থাকবার অনুমতি তিনি পেয়েছিলেন। ঠিক সেই সময় আর একটি রাজবন্দী ছেলের অস্ত্রোপচার হয় সেখানে। একদিন কমলাদি গিয়ে দেখেন ছেলেটি করুণভাবে চীৎকার করছে। কমলাদি তাঁর সঙ্গে কথা ব'লে জানতে পারলেন ব্যাপারটা। আগের দিন ছেলেটিকে 'অপারেশান থিয়েটার' থেকে নিয়ে আসার পর একটা গরম জলের ব্যাগ অনাবৃত-ভাবে তার পায়ের ওপর চাপিয়ে দিয়ে যায় একটি নার্স। তার পা গেছে পুড়ে। সেদিনও সেই ফোস্কাপড়া পায়ের ওপর আবার গরম জলের ব্যাগ বসিয়ে দিয়ে গেছে। ও যতই বলে—'সরিয়ে নিন ব্যাগ, আমার কষ্ট হচ্ছে।' নার্স সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়—'ঠিক আছে।' অথচ ছেলেটির উঠবার শক্তি ছিল না যে সে নিজে ওটা সরিয়ে রাখে। কী দুঃসহ যন্ত্রণা! এও ঘটল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে, যে হাসপাতাল ইংরেজ শাসন ব্যবস্থার বহুঘোষিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন!

নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা প্রভৃতির বাহ্যিক আবরণ যথাযথভাবে রক্ষিত হচ্ছে বহুসহস্র অর্থব্যয়ের বিনিময়ে। কিন্তু যে দীন-দরিদ্র-আতুর-জনের জন্যে হাসপাতাল, তাদের জন্যে যে সেখানকার প্রবেশপথ শুধু সংকীর্ণ তা নয়, আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাও শোচনীয়। নার্স থেকে আরম্ভ ক'রে মেথর-জমাদার পর্যন্ত সমস্ত কর্মচারীগোষ্ঠী আমলাতান্ত্রিক চালে কর্তব্য পালনে রত। হৃদয়বৃত্তির কোন বালাই নেই সেখানে।

'গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ে'

কমলাদি প্রেসিডেন্সি জেল থেকে ফিরে এলেন। সঙ্গে নিয়ে এলেন বহু কাহিনী। মায়াদিকে স্লো-পয়জন (slow-poison) করা হয়েছে। মির্জাপুর স্ট্রীটের অমিয়-নিবাসে ডিনামাইট প্রাপ্তি সম্পর্কে ধরা পড়েন মায়াদি। বিচারে পাঁচবছরের সশ্রম কারাদণ্ড হল। কিন্তু পাঁচ বছর পরেও যাতে পুনরায় সুস্থ সবল জীবন না যাপন করতে পারেন তারই ব্যবস্থা করেছে ইংরেজের অনুচরেরা। দেশকে যারা ভালবাসে তাদের বিনষ্ট করবার জন্যে দেশকে যারা শোষণ করে তাদের পক্ষে কোন অন্যায়ই অন্যায় নয়। ন্যায়-নীতি আর ধর্মের মুখোস ওরা এমনি ক'রেই প্রয়োজন হলে খুলে ফেলে। শোভাদিকে আঘাতের পর আঘাত ক'রে পাগল ক'রে দেওয়ার কথাও শুনলাম, যেমনি ক'রে ওরা পাগল ক'রে দিয়েছিল বাঙলার বিপ্লবী-বীর উল্লাসকর দত্তকে। সত্যিকার বিপ্লবী চরিত্র ছিল এই শোভারাণী দত্তর। পুলিশ কর্মচারীরা পর্যন্ত তাঁর নামে শঙ্কিত হয়ে উঠত। লেবঙে বাঙলার শাসনকর্তা স্যার জন এণ্ডারসনের হত্যা-প্রচেষ্টা সম্পর্কে যেদিন শোভাদি ধরা পড়লেন সেদিন পুলিশ কর্মচারী চীৎকার ক'রে উঠেছিলেন, পেয়েছি। অর্থাৎ বাঙলার বিপ্লব আন্দোলন নির্মূল করার প্রয়োজনে যাঁদের কর্মক্ষেত্র থেকে অপসারিত করা প্রয়োজন তাঁদের মধ্যে বিশেষ একজন

হিসাবে তাদের খাতায় শোভাদির নাম লেখা ছিল। শিকারী বেড়ালের দৃষ্টি নিয়ে চারদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল তারা শোভাদিকে, কিন্তু ধরতে পারেনি এতদিন। পুলিশ চেয়েছিল লেবং মামলাতেই শোভাদিকে সারাজীবনের জন্যে জেলে রাখবার ব্যবস্থা করবে, কিন্তু তা' তারা পারেনি। আর সেই আক্রোশে জেলে বিচারাধীন বন্দী-হিসেবে থাকাকালে জমাদারনীর সাহায্যে 'লক্-আপ' খুলে দরজার বড় বড় তালা দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করা হয়েছে। তারই ফলে কিছুদিনের মধ্যে ঘটে তাঁর মস্তিষ্ক-বিকৃতি। এসব কাহিনী যখন শুনি তখন ক্ষোভে ক্রোধে আমরা ফুলতে থাকি। কিন্তু অসহায় আমরা, কিছুই করবার উপায় নেই, কারাপ্রাচীরের অন্তরালে অবরুদ্ধ, কর্মশক্তিহীন। সহ-সংগ্রামিকাদের ওপর এই সব নিপীড়নের কাহিনী উত্তেজিত করে তোলে আমাদের। সমগ্র অন্তর ব্যথিত হয়ে ওঠে। কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই কি এমনিতর নিপীড়ন আর লাঞ্ছনার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না? পুলিশী অত্যাচারের তাণ্ডব কি আমাদের অনেককেই ভোগ করতে হয়নি? আজকের দিনে এই আমাদের সান্ত্বনা,—যে পুলিশ করেছে বাংলার শত শত ছেলেমেয়েকে এমনি নির্মম নিপীড়ন আর নির্যাতন তাদের ঘটেছে রূপান্তর, তারাও আজ বিপ্লবীদের স্মৃতিচিহ্ন-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করছে জনগণের সঙ্গে এক হয়ে। যে ইলিশিয়াম রো'র (বর্তমানে লর্ড সিংহ রোড) কক্ষে কক্ষে এখনও জাতীয় পতাকার ধারক ও বাহকদের আর্ত চীৎকার অবরুদ্ধ হয়ে আছে, গোয়েন্দা-পুলিশের সেই বিভীষিকার লীলাক্ষেত্রের শীর্ষদেশে আজ জাতীয় পতাকা পত পত করে উড়ছে।

এব মধ্যে একদিন বীণাদি নীনিদি ও আমি তিনজনে মিলে ঠিক করলাম যে আমার বদলে একদিন নীনিদি এসে রাত কাটাবেন আর আমি তাঁব বদলে ওঁদের ওখানে গিয়ে রাত কাটিয়ে আসব। যেমনি খেয়াল হওয়া অমনি সেটাকে কাজে পরিণত করতে লেগে গেলাম আমবা। এ যেন জেল কর্তৃপক্ষেব সঙ্গে বুদ্ধির লুকোচুরি খেলা! তাদের সুনিয়ন্ত্রিত পাহারা-ব্যবস্থার ওপর টেক্কা দিতে হবে—এটাই তো আসল মজা। দুপুর থেকে পেটে ব্যথা হচ্ছে ব'লে আমাকে শুইযে রাখা হল। সবাই এসে দেখে যাচ্ছে, ডাক্তাবকে ডেকে পাঠান হচ্ছে। বার বার আমি বমির ভাণ করছি। কেউ মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, কেউ বা 'আহা' বলে সমবেদনা জানাচ্ছে।

বিকেলের দিকে ডাক্তারকে বলা হল 'মবফিযা' দিতে। বিমলাদি বোঝালেন ডাক্তাবকে, 'মবফিয়া' দিলে তো ও ঘুমিয়ে পড়বে, আপনাদের আব বার বার ডাকতে হবে না।'

ডাক্তার মবফিয়া দিয়ে গেল, আমিও ঘুমেব ভাণ ক'রে পড়ে বইলাম। নীনিদি আমাব শুশ্রূষার ভাব নিয়ে শিয়রে বসে বইলেন। সবাইকে সেখান থেকে সবিয়ে দেওয়া হল, পাছে আমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। এই ফাঁকে ঘব থেকে বেরিয়ে কুয়োর পাড় ডিঙিয়ে গিয়ে বসে রইলাম স্নানের ঘরে সন্ধ্যার অন্ধকার পর্যন্ত। স্নানের ঘরে আবার সাধারণ কয়েদিরা আসে দিদিমণিদের কাপড়-জামা ঠিক ক'রে রাখতে। মহা মুস্কিল! বীণাদি, নীনিদি, বিমলাদি, এরা সব এক এক ক'রে এসে আমাকে আগলে রইলেন স্নান করার নাম ক'রে। অন্ধকার হতেই ছুট দিলাম গন্তব্যস্থানের দিকে। ওদিকে আমাদের ঘরে রাত্রে আমাদের পাহারা দেওয়ার জন্যে দু'জন মেয়ে-পাহারাদার থাকত। তাদেরও হাত করা হয়েছিল।

তারাও তখন আমাদের দলে। ডেটিনিউদের লক-আপ হওয়ার সময় রাত ন'টা। ডেপুটি জেলার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন আর জমাদার ও জমাদারনী দু'জন গুণতি ক'রে দেখে যায় সব ঠিক আছে কি না। কেউ শুয়ে থাকলে তার গায়ের ঢাকনা খুলে দেখে। নীনিদির বিছানায় আমি শুয়ে রয়েছি চাদর মুড়ি দিয়ে। অভ্যাসমত জমাদারনী গেছে দেখতে আমি নীনিদি কি না।

কল্যাণীদি ব'লে উঠলেন, 'জমাদারনী, আজ ওর শরীর ভাল নেই। ওকে আর জাগিও না। দেখছ না, ওর পা দেখা যাচ্ছে?'

ওরা চাদর তুলে তুলে দেখবে এটা অনুমান ক'রেই পায়ের খানিকটা চাদরের বাইরে রেখেছিলাম। আর কোন গোলমাল হল না। জমাদারনী গুণতি শেষ ক'রে বেরিয়ে গেল। নির্বিঘ্নে রাত কেটে গেল। সকালবেলা 'লক-আপ' খোলার পর আবার সবাই একত্র হয়ে গেলাম। কর্তৃপক্ষদের মধ্যে কেউ জানতেও পারল না। আমরা খুশী হলাম আমাদের চাতুর্যে। এ যেন পলায়ন-পর্বেরই একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ।

ডাক্তারবাবু

হিজলী বন্দিশালায় এক ডাক্তার ছিল ভারি মজার। খুব ভীরু-প্রকৃতির লোক। নীনিদির ছিল এক বিদ্‌ঘুটে রোগ, ডাক্তারী পরিভাষায় যার নাম হচ্ছে 'এক্স-অফ্‌থেলমিক গয়টার'। এতে হৃদ্‌যন্ত্র ও পরিপাক-যন্ত্র দু'টো একসঙ্গেই আক্রান্ত হয় এবং তাতে রোগী শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে। নীনিদি বিশ-পঁচিশ দিন পর পর এমনি ধরণের বমি, পেটের অসুখ ও জ্বরের আক্রমণে কাহিল হয়ে পড়তেন। প্রথমবার যখন এই রোগের আক্রমণ হয় তখন মেডিক্যাল অফিসার ভয় পেয়ে 'স্যালাইন' দিতে আদেশ দিলেন।

কিন্তু ডক্টর ভগৎ বললেন, 'এ কলেরা কেস্ নয়, স্যালাইন দিতে হবে না। স্যালাইন না দিলে যদি কোন ক্ষতি হয় তার দায়িত্ব আমার।'

যিনি মেডিক্যাল অফিসার তাঁর দর্শন কদাচিৎ পাওয়া যেত আমাদের জেনানা-ফাটকে। তাঁর নীচে বড় ডাক্তারবাবু এবং তাঁর নীচে ডক্টর ভগৎ। তাঁরও নীচে ছিল কম্পাউণ্ডার। এই শেষোক্ত তিনজনই ছিলেন আমাদের পক্ষে অধিগম্য। ডাক্তার ভগৎ ছিলেন জাতিতে মুসলমান, মার্জিতরুচি ভদ্রসন্তান। কাজে-কর্মে ছিলেন চটপটে এবং ডাক্তারী শাস্ত্রের প্রতি ছিল তাঁর নিষ্ঠা, এজন্যে তিনি আমাদের সবারই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস লাভ করেছিলেন। তাঁর মধ্যে খানিকটা ছেলেমানুষির ভাবও ছিল—যাকে আমরা বলি বাহাদুরিপনা। বড় ডাক্তারবাবু আর যাই জানুন ডাক্তারিটা জানতেন না ব'লেই ছিল আমাদের ধারণা। উপরওয়ালাদের মনস্তুষ্টি বিধান করতে পারলেই চাকুরি-জীবনে উন্নতি এবং এই পদ-লেহনের আর্ট তাঁর বেশ ভালই জানা ছিল। তাঁকে জব্দ করবার জন্যে আমরা ইচ্ছে ক'রে তাঁর কাছে গিয়ে নানা কল্পিত রোগের বিবরণ দিয়ে পরামর্শ চাইতাম। তিনি সোজাসুজি বলতেন, 'দ্যাখেন মা, আমার বয়স হইছে। এখন আর পারি না। আপনারা সব ডাক্তার ভগতের কাছে কইবান অনে। আমিও তারে কইয়া দিমু আপনাগো ভালা কইর‍্যা দেখবার লাগ্গ্যা।'

নীনিদির অসুখ সেবার খুব বাড়াবাড়ি হয়েছে। দেখতে দেখতে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তাঁর চেহারারও পরিবর্তন হয়ে গেল। কমান্ড্যান্ট লুনার্ড সাহেব এলেন দেখতে। মেডিক্যাল অফিসার নিজেই এলেন। আমাদের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সীমা নেই। অবশেষে সন্ধ্যার দিকে নীনিদি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন। মুখে ফুটে উঠল সেই স্বভাবসুলভ হাসি।

পরদিন বেলা এগারটার সময় লুনার্ড সাহেব এলেন জেল পরিদর্শনে। প্রথমে গেলেন হাসপাতালে নীনিদিকে দেখতে। সঙ্গে

ছিলেন বড় ডাক্তারবাবু। তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'How is she ?'

বড় ডাক্তারবাবু উত্তর দিলেন, 'Well Sir'.

অদ্ভুত তাঁর উচ্চারণ ও জবাব দেওয়ার ভঙ্গী। কমানড্যাণ্ট বুঝতেই পারলেন না। কণ্ঠস্বরে বলে উঠলেন, 'What ?'

ডাক্তারবাবু উত্তব দিলেন, 'Slight Sir, better Sir'.

অধিকতর ক্রুদ্ধ হয়ে কমান্‌ড্যাণ্ট তাঁর প্রশ্নেব পুনরাবৃত্তি করলেন।

এবাব ডাক্তার গলদঘর্ম হয়ে উত্তর দিলেন, 'All right, Sir'. সঙ্গে সঙ্গে নতিব ভঙ্গীতে মাথা অনেকখানি নুইয়ে ফেললেন।

তাঁর অবস্থা দেখে এত দুঃখের মধ্যেও আমাদেব হাসি পেল। কমান্‌ড্যাণ্ট চলে যাওয়ার পব কমলাদি, কল্যাণীদি, পুঁটুদি, সুধাদি, সবাই মিলে চেপে ধরলেন ডাক্তারবাবুকে—'All right কেন বললেন ?'

ডাক্তারবাবু কাতরভাবে কৈফিয়ৎ দেন—'কী করুম্ কন্ ? কমানড্যাণ্ট যে আমার কথা মোটে বোঝেই না।'

বিকেলে আবার বড় ডাক্তারবাবু এসেছিলেন নীনিদিকে দেখতে। কল্যাণীদিকে সবিনয়ে অনুরোধ ক'রে গেলেন যেন তাঁকে রাত্রিবেলা ডাকা না হয়। অনুনয়েব সুবে বললেন—'দ্যাখেন, একটি কথা ; মাঝরাতে আমারে ডাকবেন না আপনাবা। কন্‌তো এখনি একটা ইনজেকশন্ দিয়া যাই। রাতের বেলা ডাকলে আমার বড় কষ্ট হয়।'

আমরা জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ইনজেকশন্ দেবেন এখন ?'

ডাক্তারবাবু জবাব দিলেন, 'ক্যান ? 'মরফিয়া'—বেশ ঘুমাইয়া থাকব অখন।'

অথচ নীনিদিকে মরফিয়া দেওয়া একেবারে বারণ ছিল। হেসে কল্যাণীদি বললেন, 'না, আপনাকে ডাকব না, ভয় নেই আপনার।'

খুশী হলেন ডাক্তারবাবু। যেতে যেতে একটা গল্পও ব'লে গেলেন—

কোন্ একদিন রাত্রে হিজলীর অন্য এক জেলের কোন্ অফিসারের অসুখে তাঁর ডাক পড়েছিল ইন্‌জেকশন্ দিতে।—'গ্যালাম্, বেটা এমন মোটা, সুইচ মোটেই ঢুকে না। অর্ধেকখানা গিয়্যা সুইচ আটকাইয়া গ্যালো। করি কি, দু'জনে মিল্যা ঢুকাইল্যাম। বেটার গায়ে যা শক্ত চর্বি, সুইচ কি সহজে ঢুকতে চায়?'

গল্প ব'লে ডাক্তারবাবু চলে গেলেন। আমরা সব ভাবতে লাগলাম, এই সব লোকের হাতে রয়েছে বাঙলার সেরা ছেলেমেয়েদের জীবনের দায়িত্ব।

বর্ষচক্র

১৯৩৫ সাল। পৃথিবীর আকাশ ধূমায়িত হয়ে উঠেছে। মুসোলিনীর সাম্রাজ্য-লিপ্সা প্রকাশ পেল আবিসিনিয়া আক্রমণে। সেখানে উপ্ত হ'ল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বীজ। জেলে ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্র পাওয়া যায় না। আমাদের বরাদ্দ ছিল দৈনিক 'স্টেটসম্যান' এবং তাও পেতাম বিকেলের দিকে। এই স্টেটসম্যান কাগজে আবিসিনিয়ার যুদ্ধে ইংরেজদের নিরপেক্ষতা নীতির ব্যাখ্যা পড়তাম আর ধিক্কার দিতাম ইংরেজদের কূটবুদ্ধিকে। এদিকে ভারতের ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভিত যতই নড়ে উঠছে ততই বেড়ে চলছে তাদের অত্যাচার। মরবার আগে মরণ-কামড়। গান্ধীজী পরিচালিত গণ-আন্দোলন এর আগেই থেমে গেছে। বাঙলার বৈপ্লবিক আন্দোলনও স্তিমিতপ্রায়। মানবেন্দ্রনাথ সে সময় ফিরলেন ভারতবর্ষে। প্রগাঢ় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আমাদের তাঁর প্রতি। তাঁর বিপ্লবী জীবনের কাহিনী উপন্যাসের মতই রোমাঞ্চকর মনে হত আমাদের। তিনি দিয়েছিলেন বাঙলার বিপ্লব আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক মর্যাদা। কিন্তু তখন কি ভাবতে পেরেছিলাম, আমাদের এই সর্বজনবরেণ্য নেতা পরবর্তীকালের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ইংরেজদের সহায়তা করবেন।

একদিন খবরের কাগজে দেখলাম, পণ্ডিত জওহরলাল তাঁর কারাজীবনের মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই মুক্তি পেয়েছেন। এর কিছুদিন আগে সর্তাধীন মুক্তির প্রস্তাব তিনি অগ্রাহ্য করেছিলেন। প্রিয়তমা পত্নীর অন্তিম দিনের আহ্বানও তাঁকে আত্মমর্যাদাভ্রষ্ট করতে পারে নি। মুক্তি পেয়েই তিনি রওনা হলেন সুইজারল্যাণ্ডে স্ত্রীকে সুস্থ ক'রে তোলার আশা নিয়ে। ১৯৩৬ সালের মার্চ মাসে তিনি ফিরে এলেন একা। কমলা নেহেরু নেই। কী দুঃসহ এই শোক তাঁর পক্ষে, সেটা আমরা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করলাম। কমলা তো শুধু তাঁর স্ত্রী ছিলেন না,—একাধারে স্ত্রী, সখী ও সহকর্মিণী।

হে বন্ধু বিদায়

আমি তখন অসুস্থ। উপযুক্ত চিকিৎসা-ব্যবস্থার দাবি জানালাম। কিন্তু বন্দিশালার কোন দাবিই প্রথমে গ্রাহ্য হবার নয়, তা যতই ন্যায়সঙ্গত হোক না কেন! বাধ্য হয়ে অনশন করতে হল। বীণাদিও সহানুভূতিসূচক অনশন করলেন। সেই রাত্রেই আদেশ এল আমাদের দু'জনকে মেদিনীপুর বদলি করার। লক-আপে আমরা দু'টি প্রাণী। তালাচাবি লোহার গবাদের বাইরে ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে আছে ডেটিনিউরা। কেউ এসে 'মনু' 'শান্তি' ব'লে ডেকে পেছন ফিরে চলে যাচ্ছে নিজেদের উদ্গত অশ্রু রোধ করার জন্যে। পুঁটুদি নিজের হাতে রান্না করে আমাদের খাওয়াবার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত। কমলাদি একফাঁকে সবার অলক্ষ্যে আমার হাতটা চেপে ধরে বললেন —'মন খারাপ ক'রে থেক না শান্তি। আমরা যে সব ফরওয়ার্ড মার্চের সৈনিক।'

লীলাদি রেণুদির মারফৎ আমাদের লিখে পাঠালেন তাঁর শুভ-কামনা। বন্দিশালায় লীলাদি ছিলেন সম্পূর্ণ অন্যগোত্রের মানুষ। একমাত্র তিনিই আমাদের সঙ্গে ব্যবধান রেখে চলতেন। হিজলীর জীবন শেষ ক'রে আমরা ফিরে এলাম মেদিনীপুরে। সেখানে ছিলেন কল্পনাদি আর ছিল উজ্জ্বলা, লেবং কেসের অমিয়া মজুমদার ওরফে উজ্জ্বলা। ওকে নতুন ক'রে পেলাম।

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা

জেলে ব'সে আমরা দেশের রাজনৈতিক গতিপ্রবাহ গভীর আগ্রহের সঙ্গে অনুধাবন করতাম এবং দেশের দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলার জন্যে নিজেদের মনকে প্রস্তুত ক'রে তুলতাম। কংগ্রেসের মধ্যে সমাজতন্ত্রী মতবাদ ক্রমশ প্রাধান্য লাভ করছে। রাষ্ট্রপতি পণ্ডিত জওহরলাল সমাজতন্ত্রী নেতাদেরও ওয়ার্কিং কমিটিতে গ্রহণ করলেন। হয়ত বা দক্ষিণপন্থ ও বামপন্থী নেতাদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিভেদ তাঁকে শঙ্কিত ক'রে তুলেছিল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের বিভিন্ন দলকে একত্রিত করার প্রয়োজন তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হলেও তিনি তাঁর মতবাদকে সম্পূর্ণরূপে কংগ্রেসের ওপর চাপিয়ে দিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চাননি।

কংগ্রেসের বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন বিধিবদ্ধ হল এবং তার সঙ্গে যুক্ত হল 'ম্যাক্‌ডোনাল্ডি-বাঁটোয়ারা', যার ফলে ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক সমস্যা প্রখরতর হয়ে উঠল। কংগ্রেস সর্বতোভাবে এ আইন বর্জন করলেও এ-আইনের বিধান অনুযায়ী নির্বাচন-দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হবে ব'লেও স্থির করল। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে কংগ্রেসের এই না-গ্রহণ না-বর্জন নীতি বহু কংগ্রেসকর্মীকে বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলল। একে কেন্দ্র ক'রে কংগ্রেসের

মধ্যে নতুন দলের পত্তন হল। কাগজেই সব পড়েছি আর নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছি, কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কি? একদিন খবর পাওয়া গেল, কংগ্রেস ওয়ার্কিং-কমিটি 'আবিসিনিয়া-ডে'. ঘোষণা করেছে। আমরা সবাই খুব খুশী হলাম। সাম্রাজ্যলিপ্সার কবলে নিষ্পেষিত অসহায় অশ্বেতাঙ্গ জাতির প্রতি কংগ্রেসের এই সুস্পষ্ট সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশকে আমরা অভিনন্দন জানালাম। গর্ববোধ করলাম, আমাদের দেশের কর্ণধারগণ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অত্যাচারিত ও নির্জিত মানুষের সমস্যার সঙ্গে নিজের দেশের সমস্যাকে এক ক'রে দেখছেন। কংগ্রেস ক্রমশই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে উঠছে।

দিনাজপুরে

এবারে বেশীদিন আমাদের মেদিনীপুর থাকতে হয়নি। একদিন ভোরবেলা উপ-কারাধ্যক্ষ এসে আমাদের দিনাজপুরে বদলি হবার হুকুম জানিয়ে গেলেন। খুশীতে আমাদের মন নেচে উঠল। মেদিনীপুরের নিষ্প্রাণ পারিপার্শ্বিকতার কবল থেকে মুক্তি পাব এবং সেই সঙ্গে পাব মেদিনীপুর থেকে দিনাজপুরের দীর্ঘপথ অতিক্রমণের বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা। এই দ্বিবিধ সম্ভাবনার আনন্দে আমরা চঞ্চল হয়ে উঠলাম। মেদিনীপুরে ট্রেনে চড়ার পর থেকে সারাটা পথ গান গেয়ে গেয়ে চলা! গান ত' শুধু নিজেদের মনের আনন্দের জন্যে নয়, অন্যদেরও আমরা বোঝাতে চাই আমরা বেঁচে আছি। যে পরিপূর্ণ প্রাণাবেগ আমাদের বিপ্লবী-জীবনে চালিত করেছিল সেই প্রাণপ্রাচুর্য নিয়েই আমরা বেঁচে আছি, ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী-পরিকল্পিত সমস্ত মরণধর্মী নারকীয় ব্যবস্থাকে উপহাস ক'রে। আমাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে দেশের লোক সচেতন থাকবে না, একথা আমরা ভাবব কেমন ক'রে? আমাদের ঘিরে জনসমাগম হত প্রচুর, নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করত স্পষ্টতই আমাদের কেন্দ্র ক'রে। কিন্তু পুলিশের গণ্ডী অতিক্রম ক'রে

আমাদের সান্নিধ্যে ওরা আসতে পেত না। তবু আমরা এতেই খুশী। আমাদের দেশবাসীর শ্রদ্ধা আমরা অর্জন করতে পেরেছি।

তখন বর্ষাকাল। সকাল ৯।১০টা আন্দাজ আমরা দিনাজপুর জেল-গেটে গিয়ে পৌঁছুলাম। ভেতরে গিয়ে দেখি, সেখানে আর একজন রাজবন্দিনী আস্তানা গেড়ে বসেছেন—বরিশালের শ্রীমতী সরোজ চৌধুরী। আমাদের পেয়ে তিনি ভারি খুশী। একলা থাকার বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি পেলেন। আমরা কিন্তু প্রথম প্রথম ওঁকে আমল দিতেই চাইতাম না। আমাদের চারজনকে নিয়েই যেন আমাদের একটা স্বতন্ত্র রাজ্য। আমাদের প্রাণ-চাঞ্চল্য সরোজদিকে বিস্মিত ক'রে তুলেছিল। পরে একদিন তিনি নিজেই একথা স্বীকার করেছিলেন। দিনাজপুর জেলটি ছোট্ট। জেলের যে অংশে আমাদের রাখা হয়েছিল সে অংশটা ছিল সবচেয়ে সুন্দর। অনেকগুলো গাছে অজস্র বেলফুল ফুটে থাকত। যেদিকে তাকান যায় সেদিকেই সারিসারি গাছ—কচি চিকণ পাতায় ভরা। চারদিকে যেন সবুজের মাতামাতি। সেখানকার কারাধ্যক্ষের মধ্যেও একটা স্নেহপ্রবণ মানুষ ছিল বেঁচে। আমাদের সঙ্গে তাঁর আমলা-তান্ত্রিক ব্যবহার ছিল না। আমাদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও স্নেহের পরিচয় পাওয়া যেত। দু'এক ঝুড়ি কাঁচা আম উপঢৌকন আসত মাঝে মাঝে। দিনাজপুরী ফজলি আম কাঁচা অবস্থাতেই কী মিষ্টি! আমাদের অংশে ছিল দু'টো মাত্র ঘর। বীণাদি আর সরোজদি আমাদের তিনজনের চেয়ে বয়সে বড়। তাই অগ্রজাসুলভ দাক্ষিণ্যে অপেক্ষাকৃত ভাল ঘরটিই আমাদের দিলেন। প্রায় রাত্রে শুনতে পেতাম বীণাদি ও সরোজদি ওঁদের ঘরে গভীর রাত পর্যন্ত আলোচনা করছেন। কৌতূহল হলেও জিজ্ঞাসা করতাম না কিছু। সরোজদি ছিলেন ডেটিনিউ। তাঁর জন্যে বরাদ্দ ছিল দৈনিক ভাতা। সে ভাতার অংশ আমরাও পেতাম। তাই দিয়ে হত সপ্তাহান্তে একদিন ভূরিভোজের আয়োজন। এমনি ক'রেই সেখানে নতুন জীবনযাত্রা আরম্ভ করলাম।

যাবার দিনে জানি যেন

একদিন সকালবেলা সঞ্জীবনী কাগজ পড়তে পড়তে কল্পনাদি চীৎকার ক'রে বলে উঠলেন, 'মনুদি, নীনা মারা গেছে।' ছুটে গিয়ে কাগজখানা কল্পনাদির হাত থেকে নিয়ে এলাম। বীণাদির মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে—কাগজখানা হাতে নিয়ে কাঁপছেন। প্রিয়জনবিয়োগের এমন মর্মান্তিক দৃশ্য এর আগে প্রত্যক্ষ করিনি। বীণাদি ও নীনিদির মধ্যে যে কী গভীরতম সম্পর্ক ছিল সেটা আমার জানা ছিল ব'লেই বীণাদির দুঃখ নিজের বুকের মধ্যে অনুভব করতে লাগলাম। অস্ত্রোপচার হবার আগেই নীনিদি একখানি চিঠি বীণাদির নামে লিখে বিছানার তলে রেখে ব'লে যান, তিনি যদি মারা যান তবে যেন সঞ্জীবনীতে চিঠিখানা ছাপিয়ে দেওয়া হয়। মৃত্যুকে সম্মুখে রেখেও প্রিয়তম বন্ধুকে স্মরণ ক'রে গেলেন; রেখে গেলেন তাঁর উদ্দেশে ভালবাসার স্বীকৃতি।

বীণাদিকে উদ্দেশ ক'রে তিনি লিখে রেখে গিয়েছিলেন 'পৃথিবীর প্রতি শেষ বাণী' ব'লে—

'মনে হচ্ছে পৃথিবীতে আমার দিন ফুরাল। ওগো আমার সুন্দরী ইরা, প্রিয়বন্ধু, বিদায়! প্রিয়সখী, আজ তবে তুমি বিদায় দাও।.... আবার কি গো তোমার বুকে স্থান পাব? প্রিয়বন্ধু, জান কি গো কী দিয়েছ মোরে? তোমার কাছে যা পেয়েছি, তা' আমার জীবন ভ'রে দিয়েছে। সব পেয়েছি—কত পেয়েছি তার তুলনা নেই। তোমাকে শেষবার বুকভরা আমার সর্বশ্রেষ্ঠ ভালোবাসা জানাই।

'আজ যাবার বেলা চোখ জলে ভ'রে আসছে, বুক ব্যথায় ভেঙ্গে যাচ্ছে। 'তুমি তো বঁধু জান কাঁদিছে কেন আঁখি'—আবার যদি তোমায় ফিরে পাই, তবে আমার বিদায় মিলনের রূপ নেবে। বন্ধু, বিদায়!'

নীনিদির মৃত্যুসংবাদ আমাদের সবাইকে মুহ্যমান ক'রে তুলল! শোকের এক গভীর কালোছায়া আচ্ছন্ন ক'রে রাখল আমাদের পরিবেশকে। অতীত দিনের নীনিদির সান্নিধ্যের মধুর স্মৃতি, তাঁর জীবনের বিচিত্র কাহিনী প্রতিনিয়ত জাগরূক হতে লাগল আমাদের মনে। দুঃসহ ব্যথায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে দিনগুলো। স্তব্ধ হয়ে গেল আমাদের লীলা-চঞ্চল কল-হাস্যের উচ্ছলতা; বন্ধ হয়ে গেল তর্কমুখর মিলন-সভা। জীর্ণ বস্ত্রের মতই রোগখিন্ন দেহকে পরিত্যাগ ক'রে নবজন্মের জন্যে তাঁর এই প্রয়াণকে আমবা সহজভাবে নিতে পারলাম না। গীতার শ্লোক দিতে পারল না আমাদের কোন সান্ত্বনা। একটা বিষাদ-ঘন বৈরাগ্য আমাদের চৈতন্যকে আবরিত ক'রে রাখল। কবিগুরুর কথাগুলি অনুরণিত হতে থাকল মনে—

কেন এই আনাগোনা, কেন মিছে দেখাশোনা,
দুদিনের তরে।
কেন বুকভরা আশা, কেন এত ভালবাসা
অন্তরে অন্তরে।

যে নীনিদিকে পুলিশ-কর্তৃপক্ষ কিছুতেই মুক্তি দিতে চায়নি, যার সম্বন্ধে তাদের ছিল এতটা আতঙ্ক, সেই নীনিদি একেবারে মুক্তি পেলেন ইহলোকের বন্ধন থেকে। এমনি ক'রে কি একদিন সবাইকেই যেতে হবে? ছেড়ে যেতে হবে এই পৃথিবীর বন্ধন? কেন এই আসা? আর কেনই বা নিজের সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও একদিন সব ফেলে চ'লে যাওয়া! জীবনের মূল্য তো আজও ভাল ক'রে জানা হল না। শেষের দিনটিতে কি জানতে পারা যাবে?

যাবার দিনে জানি যেন
আমায় ডেকেছিলে কেন
আকাশপানে নয়ন তুলে শ্যামল বসুমতী।

প্রেসিডেন্সি জেলে

এই শোকাচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যে, বন্ধুদের রেখে আমাকে যেতে হল প্রেসিডেন্সি জেলে চিকিৎসার জন্যে। সেখানে গিয়ে পেলাম কুমিল্লার পারুলদিকে (টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলার পারুল মুখার্জী)। পারুলদি সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী। আমার সঙ্গে তাঁর চলল এই নিয়ে আলোচনা। সে সময়ে শ্রীঅশ্বিনী গুপ্তও ছিলেন প্রেসিডেন্সি জেলে। তিনি ভাল ভাল বই আমাদের পাঠাতেন। সংবাদপত্রের মধ্যে পেতাম কেবল 'স্টেটস্‌ম্যান'। হোক না স্টেটস্‌ম্যান সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের মুখপত্র, তবু তখন এই ছিল আমাদের অমূল্য নিধি। এর মারফৎ পেতাম বহির্জগতের কত বিচিত্র ঘটনার বিবরণ। সারাদিন কাগজখানা আঁকড়ে থাকতাম, তন্ন তন্ন ক'রে পড়তাম প্রতিটি পংক্তি। স্পেনের গৃহযুদ্ধ, জেনারেল ফ্রাঙ্কোর কার্যকলাপ, হিটলার মুসোলিনীর মিতালি, আবিসিনিয়া অষ্ট্রিয়া -স্পেনের ব্যাপারে বৃটেন ও আমেরিকার রহস্যজনক মনোভাব, প্রেমের মূল্য দিতে গিয়ে ইংলণ্ডেশ্বর অষ্টম এডওয়ার্ডের সিংহাসন-ত্যাগ— সংবাদগুলো পড়তাম, আর নব নব চাঞ্চল্যে মন ভ'রে উঠত। কারাগারের লৌহ-কপাট বিদীর্ণ করে বিশ্বের বিপুল প্রাণ-প্রবাহের মধ্যে নিজেদের বিলুপ্ত ক'রে দেবার আকুতি অনুভব করতাম সমগ্র অন্তরের মধ্যে। প্রেসিডেন্সি জেলে গিয়ে একটা সুবিধে হল বাইরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার। মা ছোট-বোনটিকে নিয়ে তিনমাসে তিনবার এসে দেখা করেছিলেন এবং জমাদারনীদের কড়া পাহারা ব্যর্থ ক'রে মা'র মারফৎ চিঠি পাঠিয়ে দিতাম কমলাদির কাছে। কমলাদি তখন গৃহ-বন্দিনী। কমলাদির কাছ থেকেও সংবাদাদি পৌঁছুতে লাগল আমার কাছে। তিনি আমার আত্মীয়দের নাম ক'রে আমাকে দেবার জন্যে জেল-গেটে বই জমা দিয়ে যেতেন এবং সে বইয়ের ভেতর সঙ্গোপনে আঁটা থাকত চিঠি ও টাকা।

পুলিশ ও জেল-কর্মচারীদের শ্যেনদৃষ্টিকে প্রতিহত ক'রে যথানিয়মে সেগুলো আবার কাছে পৌঁছতো। এমনি ক'রে প্রেসিডেন্সি জেলে থাকতে অনেক সংবাদ সংগ্রহ করলাম। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই প্রেসিডেন্সি জেলের মেয়াদ আমার উত্তীর্ণ হয়ে গেল ; ফিরে এলাম আবার দিনাজপুরে।

এই জেল-গেটে বই জমা দেওয়া নিয়ে একটা কৌতুকজনক ঘটনা মনে পড়ছে। তখন আমি মেদিনীপুর জেলে। আমার বড়মামা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মিত্র এলেন দেখা করতে। সঙ্গে নিয়ে এলেন কয়েকটা সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব-বিষয়ক বই। সে বইগুলো কিন্তু আমাকে দেওয়া হল না। সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বিচারে ওগুলো পড়ল নিষিদ্ধ পর্যায়ে। কেন তা আজও বুঝতে পারিনি। বড়মামা চব্বিশ পরগণা জেলার অন্যতম জনপ্রিয় কংগ্রেসনেতা। সুতরাং ইংরেজ কর্মচারীদের চোখে তিনি রাজদ্রোহী। তাঁর স্পর্শ হয়তো নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বমূলক পুস্তককেও রাজদ্রোহের জীবাণুবাহী ক'রে তুলেছিল ; হয়তো বা সমাজতত্ত্ব ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকতে পারে তা' অতিবুদ্ধি কর্মচারীটির মনেই হয়নি। এঁরাই নির্ধারণ করতো কোন্‌টা আমাদের পক্ষে 'পাঠ্য' কোন্‌টা 'অপাঠ্য'।

রন্ধন-নৈপুণ্য

দিনাজপুরে এসে কমলাদির কাছ থেকে পাওয়া খবরগুলো বন্ধুদের কাছে পরিবেশন করতে করতে কাটল বেশ কিছুদিন। তারপরে নতুন খেলা আবিষ্কার হল। সেটা হল সারাদিন ধ'রে বিভিন্ন রকমের খাবার তৈরি। কেবলমাত্র অভ্যস্ত পদ্ধতিতে নয়, আমাদের নব-নব-উন্মেষশালিনী উদ্ভাবনী শক্তির প্রকাশ ঘটতে লাগল এইসব বিচিত্র ও বিবিধ ভোজ্য সৃষ্টির মধ্যে। কমলাদি ছিলেন এসব

বিষয়ে একেবারে আনাড়ি। আমরা ব'সে ব'সে খাবার তৈরি করতাম, আর উনি এদিক-ওদিক ঘুরে এসে ছোঁ। মেরে তুলে খানিকটা মুখের মধ্যে পুরে দিতেন। এর জন্যে বকুনিও খেতেন সরোজদির কাছে। খাবার তৈরির পাট সাঙ্গ ক'রে সন্ধ্যা হতে না-হতেই পড়তাম শুয়ে ; রাত একটা কি দু'টোর সময় উঠে আগুন জেলে করতাম চা। ইন্ধন ছিল পুরোনো বইয়ের পাতা আর খবরের কাগজ। তারপরে চা এবং সারাদিনের তৈরী খাবারের সদ্ব্যবহারের পর বসত গানের আসর। উজ্জ্বলা একটার পর একটা গানের নাম ক'রে যেত আর আমি গেয়ে চলতাম। এমনি ক'রে ভোর হয়ে আসত ; সদ্য-জাগা পাখীর কলকাকলি ভেসে আসত আমাদের কানে কারাগারের শাসনের প্রাচীরকে অগ্রাহ্য ক'রে। তারপর গান হত বন্ধ, আরম্ভ হত প্রাতঃকৃত্য সমাপনের প্রস্তুতি।

কারাধ্যক্ষ একদিন বীণাদিকে বললেন, 'আচ্ছা মিস্ দাশ, আপনারা কি রাতে ঘুমোন না?'

জবাবে বীণাদি শুধু একটু হাসলেন।

বহ্নি-সংস্কার

আমাদের এ জীবনও ক্রমশ একঘেয়ে হয়ে উঠতে লাগল। স্থির করলাম, জেলে আগুন লাগিয়ে দেব এবং দগ্ধাবশেষ জেলের ভস্মস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে একদিনের জন্যে হলেও বাইরের মুক্ত বাতাস টেনে নেব। এক সপ্তাহ ধ'রে একটু একটু ক'রে কেরোসিন যোগাড় করলাম। কড়িকাঠের সঙ্গে ঝুলানো হ্যারিকেন লণ্ঠনগুলো যখন নামিয়ে রাখা হত পরিষ্কার করার জন্যে তখন জমাদারনীদের ফাঁকি দিয়ে তেল ঢেলে নিয়ে আমরা জমাতে লাগলাম। যেদিন আগুন লাগাব স্থির হল সেদিন আমাদের সবার সে কী উত্তেজনা। যে জমাদারনী আমাদের সবচেয়ে বেশী পীড়ন করত তারই কার্যকালে আগুন লাগাব, এই স্থির

হল। বেলা বারটার ডিউটিতে এল সেই জমাদারনী। তার আগেই আমাদের কাপড় ছিঁড়ে সেগুলো কেরোসিন তেলে ভিজিয়ে সবগুলো ভেন্টিলেটার, কড়িকাঠ ও জানালার ফাঁকে ফাঁকে গুঁজে রেখে দিয়েছিলাম। এবার সেই নেকড়াগুলোতে দিলাম আগুন লাগিয়ে। দেখেই তো জমাদারনীর পরিত্রাহি চিৎকার। কল্পনাদি ছুটে গিয়ে ধরেছেন তাকে চেপে। আর আমি জমাদারনীর হাত থেকে চাবির তোড়াটা ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম প্রাচীরের বাইরে। এদিকে জমাদারনীর সঙ্গে কল্পনাদির শুরু হল গজ-কচ্ছপ লড়াই। বীণাদি ছুটে এলেন কল্পনাদির শক্তিবৃদ্ধি করতে। জমাদারনী তখন মরা-মানুষের মত শুয়ে প'ড়ে মুখ দিয়ে গোঁ-গোঁ শব্দ করতে লাগল। বীণাদি ভাবলেন বুঝি জমাদারনী মরেই গেল। বললেন, 'ভুলু, ছেড়ে দে ভাই'। ছাড়া পেয়ে জমাদারনী প্রাণপণে চীৎকার ক'রে উঠল। পাগলা-ঘন্টি উঠল বেজে। জেলের কর্মচারী, ওয়ার্ডার, জমাদার, সবাই এসে জড় হয়েছে আমাদের ফাটকের বাইরে। কিন্তু কেউ ঢুকতে পারছে না, দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। এদিকে আগুন বিস্তার করেছে তার লেলিহান শিখা। অগত্যা মই এনে দেয়াল টপকে জমাদাররা ভেতরে ঢুকল। আমাদের অপটু প্রয়াস পূর্ণ সার্থকতা পাবার আগেই নিবল আগুন। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট আর পুলিশের কর্তা এলেন ভাঙ্গা দরজা দিয়ে। তদন্ত শেষ ক'রে আদেশ দিলেন আমাদের যুথভ্রষ্ট করবার। কল্পনাদি আব আমাকে পাঠান হল মেদিনীপুর জেলে। বীণাদি আর উজ্জ্বলা প'ড়ে রইলো দিনাজপুরে। মেদিনীপুরে তখন ছিলেন কল্যাণীদি আর লীলাদি। আমাদের যাবার কিছুকাল পরেই কল্যাণীদি আদেশ পেলেন স্বগৃহে অন্তরীণ থাকার। লীলাদিই শুধু রইলেন। এবারে লীলাদির সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা জমে উঠেছিল, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে ছেড়ে চ'লে আসতে হল। তাঁর গম্ভীর বহিরাবরণ ভেদ ক'রে অন্তর্লোকের সিংহদ্বারে পৌঁছবার সুযোগ আর হল না।

পট-পরিবর্তন

এই সময় কংগ্রেস যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কর্মপন্থা গ্রহণ করল তার মধ্যে কংগ্রেসের গণসংযোগ ব্যবস্থা অন্যতম। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর প্রেরণা ছিল এর মূলে। বিভিন্ন বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সংযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তাও কংগ্রেস অনুভব করল। পণ্ডিত জওহরলালের নেতৃত্বে কংগ্রেস এই সময় ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্রবাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন যে, দুঃখ-দারিদ্র্য-পরাধীনতা পীড়িত জনগণের সত্যিকার কল্যাণসাধন করতে পারে এক সমাজতান্ত্রিক সার্বভৌম রাষ্ট্র। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস এই আদর্শ সম্মুখে রেখেই নির্বাচন-দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েছিল। এগারটি প্রদেশের মধ্যে ছ'টি প্রদেশেই কংগ্রেস অন্যদল-নিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন ক'রে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করল।

কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশে রাজনৈতিক বন্দীরা মুক্তি পেতে লাগলেন; কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার আসামীরাও বাদ পড়লেন না। কিন্তু বাঙলা দেশের বন্দীদের ভাগ্য অন্যরূপ। মুসলিম লীগ-সরকারের কোন সহানুভূতি ছিল না এদের প্রতি। বন্দী-মুক্তি সম্পর্কে তাদের মনোভাব ইংরেজদের মনোভাবেরই সমগোত্রীয়। বাঙলা সরকারও যাতে অন্যান্য কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশের অনুসরণে রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান করে তার দাবি জানিয়ে আন্দামান, দেউলী, বহরমপুর প্রভৃতি বন্দী-নিবাসের বন্দীরা অনশন ধর্মঘট শুরু করলেন। মুখ্যত তিনটি দাবি পূরণের জন্যেই এই অনশন ধর্মঘট। প্রথম—রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্য থেকে শ্রেণীবিভাগ লোপ করতে হবে এবং তাঁদের বিশেষ শ্রেণীর কয়েদী ব'লে গণ্য করতে হবে। দ্বিতীয়—সমস্ত বন্দীদের স্ব স্ব প্রদেশে ফিরিয়ে নিতে হবে। তৃতীয়—সমস্ত রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীদের বিনাসর্তে মুক্তিদান করতে

হবে। তৃতীয় দাবির আশুপূরণ যদি সম্ভবপর না হয় তবে প্রথম দু'টি দাবি মেনে নিতে হবে এই ছিল ধর্মঘটীদের সিদ্ধান্ত। বন্দীমুক্তি আন্দোলনে সর্বশক্তি নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তাঁদের অনশন ধর্মঘট বন্ধ করতে অনুরোধ জানান। এই অনশন ধর্মঘটের মস্ত বড় ফল হ'ল এই যে, রাজনৈতিক বন্দীদের সমস্ত শ্রেণীবিভাগ দূর হয়ে গেল। বাঙলার ম্যাক্‌সুইনি যতীনদাস যে দাবি পূরণের জন্যে আমরণ অনশন গ্রহণ করেছিলেন সে দাবি এতদিন পরে অভাবনীয় পরিস্থিতির মধ্যে কার্যত সফল হোল। এরই ফলে প্রায় চার বছর পরে সুনীতি ঢাকা জেল থেকে ফিরে আসতে পেল আমাদের মধ্যে।

রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তনে আমাদের মধ্যেও মুক্তির আশা সঞ্চারিত হোল। পড়াশোনা ছেড়েই দিলাম। পড়ার টেবিলগুলো খাবার টেবিলে পরিণত হোল। বইগুলো সব বাক্সবন্দী ক'রে অফিসে দিলাম পাঠিয়ে।

মুক্তিদূত

১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমাদের মুক্তি অর্জনের জন্যে গান্ধীজী এলেন কলকাতায় বাঙলার লাট ও মন্ত্রিমণ্ডলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর বাঙলা সরকার গান্ধীজীকে অনুমতি দিলেন আমাদের সকলের সঙ্গে দেখা করবার। বিভিন্ন জেল থেকে রাজনৈতিক বন্দীদের নিয়ে আসা হোল কলকাতায় গান্ধীজীকে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সুযোগ দেবার জন্যে। মেদিনীপুর থেকে আমরা চারজন—কল্পনাদি, পারুলদি, সুনীতি ও আমি রওনা হলাম কলকাতা অভিমুখে।

খড়্গপুর স্টেশনে গাড়ি থামতেই দেখি পুলিশবাহিনী পরিবেষ্টিত খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা তিন আইনের বন্দীরা ওখানে দাঁড়িয়ে

আছেন। প্রথমেই শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুপ্ত আমাদের কামরার জানালার পাশে এসে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরাও বুঝি চলেছ গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে?'

কে তাঁর কথার জবাব দেবে। তাঁদের দেখে খুশিতে আমাদের মন ভ'রে উঠেছে। তাঁদের পরিচয় তখনও জানিনে, শুধু এইটুকু জানি, দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সর্বত্যাগী সৈনিক এঁরা, রক্তবিপ্লবের ভগীরথ। নিজেরা নেমে এসে প্রণাম ক'রে নিজেরাই নিজেদের পরিচয় দিয়ে যেতে লাগলাম। তারপর পুলিশের নিষেধ অগ্রাহ্য ক'রে উঠলাম গিয়ে তাঁদেরি কামরায়। মনোরঞ্জনদা একে একে তাঁর সতীর্থদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। শ্রীযুক্ত ভূপতি মজুমদার, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত সত্য গুপ্ত, শ্রীযুক্ত ভূপেন রক্ষিত, শ্রীযুক্ত পূর্ণ দাস, শ্রীযুক্ত অরুণ গুহ, শ্রীযুক্ত ভূপেন দত্ত, শ্রীযুক্ত প্রতুল গাঙ্গুলি, শ্রীযুক্ত রসিকলাল দাস প্রমুখের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হোল। এঁদের প্রত্যেকের জীবন এক-একটা ইতিহাস। ভূপতিদা'র বৈচিত্র্যময় বিপ্লবী জীবনের কাহিনী, বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষের বাইরে তাঁর বহুধা কর্মধারার রোমাঞ্চকর ইতিবৃত্ত আমাদের মধ্যে ছিল বহুল প্রচারিত। শ্রীযুক্ত ভূপেন রক্ষিতের 'চলার পথে' আমাদের মধ্যে জাগাত উদ্দীপনা। জেলে ব'সে অনুশীলনের বন্ধুদের মুখে মহারাজ শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর সম্বন্ধে কত কাহিনীই না শুনেছি? শ্রীযুক্ত রসিকলাল দাসের খ্যাতি ছিল বোমা-বিশারদ ব'লে। শ্রীযুক্ত পূর্ণ দাসের সংগঠনী শক্তি ও তেজস্বিতার কত গল্পই না শুনেছি! শ্রীযুক্ত ভূপেন দত্তের মধুর স্বভাব ও পাণ্ডিত্য জেলে আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল। এঁদের সঙ্গে পরিচিত হবার গৌরব ও আনন্দ আমাদের উদ্বেল ক'রে তুলেছিল। সারা রাস্তা হল্লা করতে করতে চললাম। দুপুরে একটায় গিয়ে পৌঁছলাম প্রেসিডেন্সি জেলে। জেলের গেটে ভিড় জমে আছে; রাজনৈতিক বন্দীরা সব দাঁড়িয়ে

আছেন আমাদের দেখবার জন্তে। তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঢুকলাম জেনানা-ফাটকে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমাদের জন্মে খাবার এসে পৌঁছল—অপর্যাপ্ত খাবার! দাদারা যত্ন ক'রে পাঠিয়েছেন। কী খুশি আমরা! ওঁদের স্নেহের স্পর্শ পেলাম সেই খাবাবের মধ্যে। আহার শেষ না হতেই জমাদারনী তাড়া দিল, 'শীগগির তৈরি হয়ে নিন, গান্ধীজী এসে পড়বেন এখুনি।'

খেয়ে ঘরে ঢুক্‌ছি এমনি সময় দরজায় টুক্ টুক্ শব্দ শুনে ফিরে দেখি, গান্ধী-টুপি পরা ফর্সা লম্বা সুদর্শন এক ভদ্রলোক এবং তাঁর পেছনে বাপুজী। পরে জেনেছিলাম সেই ভদ্রলোক বাপুজীর সেক্রেটারি মহাদেব দেশাই।

কারা-প্রাঙ্গণে মহাত্মাজীর আবির্ভাব অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে আমার চিত্তে। তাঁর স্মিতহাস্য-উদ্ভাসিত প্রশান্ত আননে অনন্যসাধারণত্বের যে দীপ্তি আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম সেদিন, তা আমায় মুগ্ধ ও অভিভূত ক'রে তুলেছিল। সেদিন এবং তারপরে যখনই গান্ধীজীর কথা ভেবেছি তখনই একটি কথা বার বার মনে হয়েছে। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ আর মহাত্মা গান্ধী—নবজাগ্রত ভারত-আত্মার দু টি হিরণ্ময় দিব্যচক্ষু। অথচ দু'জনের চেহারার মধ্যে কী বিস্ময়কর বৈসাদৃশ্য! সৌন্দর্য মানুষের দেহকে আশ্রয় ক'রে কত সুন্দর হতে পারে বোধ করি পৃথিবীতে রবীন্দ্রনাথই তার চূড়ান্ত নিদর্শন। আর গান্ধীজী? সুন্দর ত' তাঁকে কিছুতেই বলা চলে না। কিন্তু আত্মিক সাধনার দিব্যজ্যোতি মানুষের সাধারণ দেহকেও যে কতটা মহিমা দান করতে পারে গান্ধীজীকে দেখে বার বার তাই মনে হতে লাগল। তাঁর স্বচ্ছ দেহাবরণকে ভেদ ক'রে আত্মার পবিত্রজ্যোতি যেন বিকীর্ণ হচ্ছিল। একটি প্রণামের ভেতর দিয়ে অন্তরের শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করলাম তাঁর পায়ে। বর্তমানকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব গান্ধীজীকে এত কাছে এমন সহজভাবে পাওয়ার আনন্দে আমরা বিভোর। তাঁর ও আমাদের মধ্যে সমস্ত ব্যবধান ঘুচে গেছে যেন। পাশাপাশি ব'সে

অনর্গল তর্ক ক'রে চলেছি। দেশের রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে আমাদের অনুসৃত পন্থা থেকে আমাদের বিচ্যুত করবার জন্যে তিনি যে যুক্তির অবতারণা করেছিলেন তা আজও অনুরণিত হচ্ছে আমার অন্তঃকরণে। আমাদের মত ও পথকে সমর্থন ক'রে সেদিন তাঁর সঙ্গে বিতর্কে মেতে উঠেছিলাম। চাপল্য ও স্পর্ধা হয়ত প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু তাতে তাঁর সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাশীলতা বিচলিত হয়নি। শুধু যে আমাদের মতবাদ ও ভবিষ্যৎ কর্ম-পন্থা নিয়ে আলোচনা হল তাই নয় একান্ত আপনজনের মত ছোটখাট তুচ্ছ বিষয় নিয়েও কথাবার্তা চলল। গান্ধীজীর কোমরে যে পকেট-ঘড়িটি ঝুলছিল সেটি একটি সেফ্‌টিপিন দিয়ে আটকানো ছিল কাপড়ের সঙ্গে। সেফ্‌টিপিনটি ছিল 'made in Germany' ছাপ মারা। আমরা প্রশ্ন করলাম, 'আপনি বিদেশী জিনিষ রেখেছেন কেন?'

হেসে বললেন, অপূর্ব সে হাসি, 'এটা একজনের দেওয়া।'

আমরাও তখন একটা একটা সোনালি রঙের সেফ্‌টিপিন তাঁকে উপহার দিলাম। পরে শুনেছিলাম যখন তিনি তিন আইনের বন্দীদের সঙ্গে দেখা করতে যান তখন আমাদের দেওয়া সেফ্‌টিপিনগুলো তিনি তাঁদের দেখিয়েছিলেন।

বিদায় নেবার আগে গান্ধীজী প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন, 'তোমাদের মুক্তি আমি অর্জন করবই। তোমাদের প্রতিষ্ঠিত করব স্বাভাবিক জীবন-যাত্রার মধ্যে।'

সেই আশার বাণী আমাদের চঞ্চল ক'রে তুলল, কিন্তু দেখতে দেখতে সেই আশার আলো আলেয়া হয়ে আমাদের থেকে দূরে চ'লে যেতে লাগল। প্রত্যাশিত মুক্তির আদেশ এল না। কিছুদিন পর আবার আমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হল মেদিনীপুর জেলে।

দিন দুই পরে মেদিনীপুরে আমাদের মধ্যে ফিরে এলেন বীণাদি ও উজ্জ্বলা। এর পরের দিনই আমাদের স্টেট-ইয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হল অন্যান্য বন্দীদের থেকে পৃথক ক'রে। মনে পড়ল একদিন এখানে

দাঁড়িয়ে দিনেশ মজুমদার আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। সেদিন আমি প্রথম মেদিনীপুর জেলে প্রবেশ করি। বিশাল এর আয়তন। লাল ইট পাতা চওড়া রাস্তা। দু'ধারে বেলফুলের সারি। অনেকগুলো নিমগাছ। শান-বাঁধানো ব্যাডমিণ্টন কোর্ট। নতুন পরিবেশের মধ্যে এসে বেশ ভাল লাগল। যে যার পড়ার জায়গা বেছে নিলাম—কেউ শান-বাঁধানো গাছের গোড়া, কেউ ঘরের পেছন, কেউবা ডালিমগাছের তলা।

মন অশান্ত, চঞ্চল। যে-কোন মুহূর্তে মুক্তির বার্তা এসে পৌঁছবে আমাদের কাছে, এ আশা কিছুতেই মন থেকে যায় না। কাপড় পরিষ্কার করা পর্যন্ত ছেড়েছি। সব সময় ফাটক পার হবার জন্যে যেন প্রস্তুত হয়ে রয়েছি। কিছুদিন পরে বীণাদিকে পুনরায় প্রেসিডেন্সি জেলে চালান করা হল অসুস্থ পিতাকে দেখবার জন্যে। একমাস পরে তিনি ফিরলেন। কিন্তু আনলেন না বহন করে কোন আশার বার্তা। আশা-নৈরাশ্যে দোলায়িত মনকে আবার শক্ত করে তুললাম। আশা-আকাঙ্ক্ষা জয়-পরাজয় সব কিছুর ঊর্ধ্বে আমাদের যাত্রাপথ প্রসারিত করার যে শিক্ষা আমরা লাভ করেছিলাম সে শিক্ষার অমোঘ বাণীকে আহ্বান করলাম আমাদের অন্তরের মধ্যে।

বন্ধন ক্ষয়

হতাশার দীর্ঘশ্বাস বুক ফেটে বেরিয়েছিল কি? হয়তো বেরিয়েছিল, হয়তো নয়। কিন্তু আশাভঙ্গের বেদনায় অভিভূত হলে ত' চলবে না! তাই আবার শুরু হল আমাদের অভ্যস্ত জীবনযাত্রার আয়োজন। অফিস থেকে জমা-দেওয়া বইগুলো নিয়ে আসা হল, সাধারণ পাঠাগার থেকে বই আনার ব্যবস্থা হল। নিজেদের ভুলিয়ে রাখার নানা ছলনা, কৌশল আবার আয়ত্ত করতে হল। তদানীন্তন জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী বি. আর. সেনের আনুকূল্যে নীল লাল সবুজ রঙের কাপড় রঙিয়ে অভিনয় করি, খাতাপত্র ছিঁড়ে ডিম ভেজে রুটি দিয়ে খাই, ভোরবেলা

উঠে বালতি-বালতি জল ফুলগাছের গোড়ায় ঢালি। এমনি করেই মন্দাক্রান্তা ছন্দে চলল আমাদের জীবন। আশাভঙ্গের বেদনার ছাপ রইল না আমাদের মনে, পড়ল না তার কোন প্রভাব আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে।

কিছুদিন পরে বীণাদি আর পারুলদি ছাড়া পেলেন। রইলাম মেজদি, উজ্জ্বলা, সুনীতি আর আমি। ইতিমধ্যে বাঙলা সরকার রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির প্রশ্ন বিবেচনা করবার জন্যে একটা কমিটি গঠন করলেন ব্যবস্থা পরিষদের বিভিন্ন প্রতিনিধিদের নিয়ে। কমিটির সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্যে আমাদের নিয়ে আসা হল প্রেসিডেন্সি জেলে। সাক্ষাৎকারের পর আবার ফিরিয়ে নেয়া হল মেদিনীপুরে। অকস্মাৎ একদিন আবার আমার আর সুনীতির ডাক পড়ল কলকাতায়। প্রেসিডেন্সী জেলে পৌঁছবার পরের দিন লক-আপ-এর একটু পরে কারাধ্যক্ষ এসে আমাদের নিয়ে গেলেন অফিসে। দেখি গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন মা, দাদা আর আমার ছোট বোনটি। সুনীতির দাদাও এসেছেন।

বন্দিশালার দ্বার হল অর্গলমুক্ত। কর্মচারীরা হাসিমুখে বিদায়-অভিবাদন জানালেন। সুদীর্ঘ সাতবছর চার মাসের কারাজীবনকে পশ্চাতে ফেলে পা বাড়ালাম অজানা ভবিষ্যতের পানে।

বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মতো হল শেষ

বন্ধনহীন প্রাণ

পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা ছিল। এবার যাবার দ্বার হল উন্মুক্ত। কিন্তু কোথায় যাবে? ছোট কারার দ্বার মুক্ত হল বটে। ওদিকে সারা ভারতবর্ষই যে ব্রিটিশ-রচিত এক বিরাট কারাগার। প্রায় ছ'শো বছরের বিদেশী শাসনের পর আজ দেশের এ কি অভিশপ্ত মূর্তি। বন্দিনী ভারতমাতা কোটি কোটি অন্নহীন বস্ত্রহীন সন্তানকে কোনক্রমে বুকে আগলে বন্ধন-মুক্তির মহালগ্নের প্রতীক্ষা করছেন। কবে সেই শুভলগ্ন আসবে?

কারার বাইরে পা বাড়াতে দ্বিধা হচ্ছে। দীর্ঘদিনের অনভ্যাসে জড়িয়ে যাচ্ছে প্রতিটি পদক্ষেপ। সোয়া সাত বছর আগে যে পরিচিত পৃথিবীকে বাইরে রেখে কারাগারের মধ্যে প্রবেশ করেছিলাম এই দীর্ঘ-দিনের ব্যবধানে সে কি আজো সেই পৃথিবীই আছে?·· থাকতে পারে না। কালচক্রের আবর্তনে সে বদলে গেছে।

কালের চাকা মাঝে মাঝে মন্দীভূত হয়ে আসে। গতি যেন স্তব্ধ হয়ে যাবে মনে হয়। তখন মহাকাল আবার হুড়মুড়িয়ে জেগে ওঠেন। লাগান তাঁর চাকায় নতুন শক্তির ঘূর্ণাগতি। বিবর্তনের পথে আসে বিপ্লবী পরিবর্তন। পৃথিবী আজ সে বিপ্লবের ঘূর্ণাবেগে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

রাতারাতি বদলে যাচ্ছে তার রূপ। বদল হচ্ছে পরিবেশের, পরিজনদেরও বদল হচ্ছে। যাদের পেছনে রেখে গিয়েছিলাম, কোথায় তারা? কেমন আছে তারা? চিনতে কি পারবে তারা আমাকে? তাদের সেই পরিচিত কিশোরী বন্ধুটিকে আবার আদর ক'রে বুকে তুলে নিতে পারবে?

কিন্তু কোথায় সেদিনের সেই কিশোরী? আমিও কি বদলে যাইনি? সাত বছর বয়স বেড়েছে। মনের বয়স তার কতগুণ কে জানে! কোথায় সেই কৈশোরের অম্লান স্বপ্ন? জ্ঞানবৃক্ষের অনেক ফল খেতে হয়েছে। কত কিছু জানতে হয়েছে! জীবনের কত বিচিত্র রূপের সঙ্গে হয়েছে পরিচয়! কত চিন্তা, কত ভাবনা, কত পন্থা, কত আলোচনা!!

কালের যাত্রা কারাগারের বদ্ধ প্রাচীরেও দোলা লাগিয়ে গেছে। বাইরের হাওয়া অচলায়তনের বুকেও দিয়ে গেছে নতুন মন্ত্র, নতুন দীক্ষা।

নতুন দীক্ষা, না পুরনো দীক্ষারই নতুন পরিণাম? মধ্যবিত্ত মনের আবেগপ্রবণতায় যে বিদ্রোহের স্বপ্ন বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভে বিদীর্ণ হয়েছিল, আজ গণবিপ্লবের সুনিয়ন্ত্রিত পথে তাই ত' তার অনিবার্য পরিণতিতে সার্থক হতে চাইছে।

বিদেশী শাসন-শক্তির একদিন অবসান অবশ্যই হবে। তারপর আসবে জনজীবনের বিপুল অভ্যুত্থান। প্রবুদ্ধ জনশক্তি আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে করবে নতুন বিপ্লবের আয়োজন। যতদিন তা সম্পূর্ণ না হয়েছে ততদিন?...

মানুষের জয়যাত্রা ত' কোনদিন স্তব্ধ হবার নয়। বিপ্লবী চেতনাকে কারাগারে বন্দী ক'রে রাখবে এমন শক্তি, এমন স্পর্ধা কার আছে?—

তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে
আলোকে আলোকে।

এক পূর্বাচলের সিংহদ্বার থেকে আরেক উদয়াচলের সিংহদ্বারে। রাত্রির তপস্যায় আসবে দিনের জাগরণ। আবার চৈতন্যের আসবে ক্লান্তি। আসবে দিগন্ত আঁধার ক'রে অমারাত্রি। আবার চলবে রাত্রির সাধনা নতুন দিনের নতুন আলোর সন্ধানে। এগিয়ে যাবে নবযুগের যাত্রীদল।

কালের যাত্রার ধ্বনি নিজের হৃৎস্পন্দনে শুনতে পাচ্ছি। এখনো সমুখে রয়েছে সুচির শর্বরী। কৈশোরে প্রজ্বলিত অরুণ বহ্নিকে অন্তরে অনির্বাণ রেখে যেতে হবে মহত্তর বিপ্লবের কণ্টক-সংকুল পথে।

পথের দু'পাশে চির-বঞ্চিত শোভাযাত্রা। তাদের ম্লানমুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর বেদনার করুণ কাহিনী। পৃথিবীর অভিশপ্ত সন্তানের দল। মাটির তলাকার অন্ধকারের বুকে থেকে অভিজাত সভ্যতার সুরম্য সৌধমালাকে চিরদিন মাথায় ক'রে রেখেছে। তাদের প্রাণান্ত পরিশ্রমে মাঠের বুকে হেসে উঠেছে সোনার ফসল, নগরে ও প্রান্তরে মাথা তুলেছে অগণিত শিল্পশালা। সমাজের ওপর-তলাকার মানুষের ভোগের থালা পূর্ণ করবার জন্যে তারা প্রাণপণ খেটে চলেছে, কিন্তু তাদের জঠরের আগুন কোনদিনই নিবল না। তাদের মনের প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার আজো আলোকিত হল না জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে। তাদের দেহ-মনের আদিম অন্ধকারের কারাগৃহ হতে মুক্তির উপায় কবে হবে?

কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্থবির সমাজের অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙ্গে চলিষ্ণু জীবনের মুক্তধারা বইয়ে দিতে হবে সমাজ-মানসের স্তরে স্তরে। চিরশোষিত অবলাঞ্ছিত জীবনে আনতে হবে মুক্তির বলিষ্ঠ প্রত্যাশা। জরাতুর জীর্ণ জীবনের দিকে-দিকে ঘটাতে হবে বিপ্লবী পরিবর্তন।

কিন্তু এই নবজীবনের অভিসারে পুরনো দিনের পথের সাথীরাও কি আসবে এগিয়ে? কে জানে। নবযুগের অগ্রপথিক-দলের সঙ্গে পা ফেলে চলতে পারব কি না তাই বা কে বলতে পারে। তবু ত' থামলে চলবে না। এগিয়ে যেতে হবে চলার পথে। শাসকের

আর শোষকের অত্যাচার থেকে আমার সমাজ আর আমার দেশের মানুষকে চিরকালের জন্যে মুক্ত করার শপথ নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে নতুন অরুণোদয়ের স্বর্ণদিগন্তে।

সঙ্গী যদি নাই জোটে, আশ্রয় যদি নাইবা মেলে, দুর্দিনের দুর্যোগ যদি ঘনিয়ে আসে দশ দিক থেকে, তবু আত্মশক্তিতে বিশ্বাস রেখে জীবনের অসম্পূর্ণ ব্রত সাঙ্গ করার সংকল্পে অটুট থাকতেই হবে।····দূর থেকে জনজীবনের কল্লোল ভেসে আসছে। বুকের মধ্যে 'দুঃসময়ে'র কবির মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেরণার সংগীত শুনতে পাচ্ছি :

ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহমোহবন্ধন,
ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা।
ওরে ভাষা নাই, নাই বৃথা ব'সে ক্রন্দন,
ওরে গৃহ নাই, নাই ফুলশেজ-রচনা।
আছে শুধু পাখা, আছে মহানভ-অঙ্গন
উষা দিশাহারা নিবিড় তিমির-আঁকা।
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা॥

॥ সমাপ্ত

‘অরুণ-বহ্নি’-প্রসঙ্গে

Circular Road
Ranchi

পরম আশীর্বাদ ভাজনীয়া স্নেহের বোন,—

তোমার 'অরুণ বহ্নি' পড়ে ভারী খুশি হয়েছি। খুশি হবার কারণগুলির মধ্যে তোমার কলমে বাংলার মা-বোনদের কথা বেশ ভালভাবে প্রকাশ হওয়াও একটি। আমার এই একটা ঝোঁক ছিল। এক বন্ধুকে ধরে একবার কিছু লেখাই। ভূপেন দত্তের সম্পাদকতায় তখন 'স্বাধীনতা' সাপ্তাহিকরূপে বেরুচ্ছিল। কাগজখানি তোমাদের সমসাময়িক। প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল 'বাংলার মা-বোন।' মাতৃজাতির অবদান বিপ্লবের পক্ষে খুবই সমৃদ্ধ। জান কি এ যুগের প্রথম গুপ্ত-সমিতির সঙ্গে এক মহিলা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন? যদিও জন্মত তিনি ছিলেন বিদেশিনী, আধ্যাত্মিক পুনর্জীবনে তিনি হয়ে গিয়েছিলেন একেবারে এদেশী। তিনি হচ্ছেন ভগিনী নিবেদিতা। ১৯০৩ সালে সার্কুলার রোডে প্রথম যে আড্ডাটি খোলা হয় তার সঙ্গে তিনি যুক্ত হন। তাঁর দেওয়া লাইব্রেরী বিপ্লবীদের বিপ্লবজীবনের আত্মিক ক্ষুধা মেটাত।

তোমার বইখানি আমার খুব ভাল লেগেছে। বিষয়বস্তু রোমাঞ্চকর অথচ প্রকৃত—একদম বাস্তব। বলার ভঙ্গী পরিপাটি, অনভিযোগ্য। ভাষা চমৎকার। ঘটনা সন্নিপাতের কায়দা অতি সুন্দর। প্রকৃত ব্যাপার পড়ছি কি রূপকথা পড়ছি ভ্রম হয়ে যায়। কত কথা মনে পড়ে, কত চিন্তার উদয় হয়। শেষটা চিন্তা, ধ্যান ও অনুধাবন ছুটে চলে ইতিহাসের পাতায়-পাতায়। কি অদ্ভুত আমাদের এই দেশ। কতবার উঠেছে, পড়েছে, কিন্তু মরে নাই। সাময়িকভাবে এর আত্মিকশক্তি মাঝে মাঝে ম্লান হয়েছে। কিন্তু আবার জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বলে উঠেছে। প্রকৃতিতে যার প্রয়োজন আছে তার জীবন থাকে অটুট।

জাতীয়-জীবনের ক্রমবিকাশ যেন তোমাদের জীবনের ভিতর দিয়ে নূতন করে পেলাম। বিপ্লবী-জীবনের আলেখ্য সত্যরূপ পেয়েছে

তোমার লেখনী মুখে। চিরন্তন সত্য এমনিভাবেই বুঝি বিকাশ লাভ করে। মনে হ'ল যেন স্বতঃসিদ্ধ খাঁটি কথাটি এইরূপে বল্‌তে চেয়েছে —রক্ত ঝরে ঝরে পড়বে আমাদের। নবজাতির নতুন, জীবনের সৌধ গড়ে তোলার নক্সা অঙ্কিত হতে থাকবে তাই দিয়ে। আত্মোৎসর্গের রূপ-রেখায় আসবে আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা। আবার কখনও মনে হ'ল তোমার ভাষার অন্তরালের ভাবটি হচ্ছে—উৎপীড়ক, তোমার মারণাস্ত্রেই হবে তোমার অত্যাচার ও উৎপীড়নের মরণ। আমার বন্দী পায়ের বেড়ির ঝন্‌ঝন্‌ প্রতিনিয়ত তাই ধ্বনিত করে চলেছে। নয় কি ?

আরও বেশী ভাল লাগল তোমার যুক্তিবাদী-মনকে ? ঈশ্বর আছেন কি নেই অনুসন্ধিৎসা। এ তত্ত্বের পারের নাগাল কি পেয়েছ ? দুরবগাহ। তবু অনুসন্ধান চলা ভাল।

হিংসা-অহিংসা। এগুলো যেন মুখোস। মুখোস দিয়ে কি মানুষ চেনা যায় ? মুখোস খসিয়ে ফেল্‌লে প্রকৃত মানুষকে দেখতে পাওয়া যায়। মানবিকতার কষ্টিপাথরে তাকে মিলিয়ে নিতে হবে। তোমাদের ভিতরের সত্যিকার মানুষকে যে আমি দেখেছি। শুধু দেখিনি, চিনেছি। সে নিত্যমানব স্বয়ং ভাস্বর। বেদবিধির 'পর দেদীপ্যমান।

তোমার জেল-জীবন পড়ে মনে হ'ল—বিপ্লবী তোমরা তেমন ভয়াবহ পরিবেশের মধ্যে শুকিয়ে মারার ব্যবস্থার মাঝে পড়েছিলে— যে অবস্থায় 'মনের ক্ষুধাই হয় মনের আহার।' কিন্তু তোমাদের অধ্যবসায় ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অসাধারণ।

তোমার বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি। আপন-ভোলা, হিসাবে অনভ্যস্ত, ভাব-চেতনায় একান্তলীন, সর্বত্যাগী, আদর্শের চরণে ঝরে যাবার সাধনা নিয়ে এসেছিল যে-সব ফুল আজও তাদের সশ্রদ্ধ অন্তরে অভিবাদন জানাই। ইতি –

তোমাদের—'যাদুদা'

শ্রীমতী শান্তি দাশ, এম, এল্‌, সি।

'অরুণ-বহ্নি' পড়লাম। আগুনের দাহন যারা সহ্য করেছে, পুড়ে যারা পূত হয়েছে তাদের ভাষায় আতিশয্য থাকে না। শান্তি দাশের রচনায় এতটুকু অত্যুক্তি নেই, বরং আছে কঠিন সংযম—তাই প্রত্যেক পংক্তিটি মনের উপর গভীর ছাপ রেখে যায়।

মনে পড়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই রবীন্দ্রনাথ লিখছেন: 'এবার বুঝি এল সর্বনেশে গো!' সেই বলাকার যুগেই আবার 'গীতালি'তে অরুণ-বহ্নির ধ্রুবপদ শুনেছি—'

"ভেঙ্গেছে দুয়ার এসেছো জ্যোতির্ময়!
তোমারি হউক জয়,"

এ' গান যখন গুরুদেব আমাদের শিখিয়েছেন তখন শান্তি-সুনীতির দল জন্মেছে কি? এ সব গান বৃটিশ কারা-প্রাচীর ভেদ করে তাদের প্রাণের অগ্নিবীণায় ঝঙ্কার দেবে সে কি তখন স্বপ্নেও কেউ ভেবেছে! যুদ্ধশেষে মহাত্মাজীর বিরাট আহ্বান—অসহযোগ আন্দোলন—দলে দলে মেয়েরা পথে বেরিয়েছে। ১৯২১ থেকে তাদের প্রস্তুতি, ১৯৩১ (১৪ই ডিসেম্বর) কুমিল্লায় প্রথম অগ্নি-পরীক্ষা; ক্রমশ চট্টগ্রামে প্রীতি ওয়াদ্দাদার ও কল্পনা দত্ত থেকে ১৯৪২-এ মেদিনীপুরে মাতঙ্গিনী হাজরার অভয়া-মূর্তি ও আত্মবলিদান—কত কথাই মনে পড়ল 'অরুণ-বহ্নি' পড়বার সময়।

স্বাধীনতা এল, তবু যারা দেখল না, কণ্ঠ যাদের নীরব—তারা বুকের প্রতি রক্তকণা ঢেলে দিয়ে গেছে।

তাঁদের স্মরণ করেছেন শান্তি দাশ—সেজন্য জয়ধ্বনি করি। তাঁর বইয়ের প্রথম পাতা খুলে পড়তে সুরু করে দেখেছি শেষ না করে থামা যায় না। এমনই সরল সতেজ সত্য ছন্দে গাঁথা এ রচনা। মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে সাবিত্রীর মত এ মেয়েরা সত্যকে খুঁজেছে এবং সেও নিষ্ঠুর সত্য। এরা ত' হেমচন্দ্র যুগের 'বাঙ্গালীর মেয়ে' নয়। এরা কি তবে 'আনন্দমঠের' রক্ততিলক পরে বেরিয়ে এল? নূতন যুগের

প্রতীক? তবু এই ধ্বংসলীলার মধ্যে এত প্রীতি, করুণা, কবিতার উৎস কেমন করে দেখা দিল এই তরুণীদের প্রাণে? এই বাঙ্গালী মেয়েদের নব 'বীরাঙ্গনা কাব্য' রচনা করতে কবে আসবেন নব মধুসূদন? হয়তো মধু-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গলার সব পিতৃপুরুষগণ— এ যুগের কন্যাদের নীরবে আশীর্বাদ করছেন।

আজ রাজনৈতিক ভাগাভাগি কাড়াকাড়ির দৈন্য ও অমানুষিকতার মধ্যে যেন দপ্ করে জ্বলে উঠল অরুণ-বহ্নির পূতশিখা, ভারতের আকাশ-বাতাস যেন পবিত্র হয়ে গেল বাঙ্গালী মেয়েদের চরম আত্মোৎসর্গে—বন্দেমাতরম্।

কালিদাস নাগ

বরীয়ান্ সাংবাদিক ও ঔপন্যাসিক— হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

শ্রীমতী শান্তি দাশের 'অরুণ-বহ্নি' পুস্তকখানি উপন্যাস অপেক্ষাও সরস এবং চিত্তাকর্ষক—Truth is stranger than fiction.

অথচ ইহা বাঙ্গালার স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসের একটি মূল্যবান অধ্যায়। সে অধ্যায় আমাদের নারীদিগের সেই সংগ্রামে আত্মনিয়োগে উজ্জ্বল। রচনা-পারিপাট্য প্রশংসা আকর্ষণ করে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় রচিত গান "আপনার মান রাখিতে জননী, আপনি কৃপাণ ধর গো" যে পরে সার্থক হইবে, তাহা সেই আমাদের কালে অনেকে মনেও করিতে পারেন নাই। কিন্তু তখন যাহা স্বপ্ন ছিল, আমাদিগের কন্যাস্থানীয়ারা তাহা সফল করিয়াছে। আমি আশা করি, এই পুস্তক বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পঠিত হইবে।

যাঁহারা রচনা, বক্তৃতা ও পরামর্শ-দ্বারা তরুণ-তরুণীদিগকে দেশ-সেবায় আত্মনিয়োগে প্রণোদিত করিয়াছেন, কিন্তু আপনারা উল্লেখযোগ্য ত্যাগের দাবী করিতে পারেন না, তাঁহাদিগের মধ্যে একজন আজ পূর্বদিনের কথা স্মরণ করিয়া লেখিকাকে আশীর্বাদ-অভিনন্দন জানাইতেছেন।

হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ

সুচরিতাসু,

যে-হস্তে একদিন পিস্তল গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই হাতে আজ কলম তুলিয়া লইয়াছেন। বিস্ময়ের সহিত ভাবিতেছি যে, কোন্ মূর্তিকে অধিক অভিনন্দন জানাইব। সেদিন পিস্তলের অগ্নি-শিখায় বিপ্লবের ইতিহাসের একটা দিক্ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিলেন, আজ লেখনীর আলোক-শিখায় তেমনি উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন নিজের এবং আরও বহুর কারাজীবনের সুখ-দুঃখ-বেদনায় গড়া একটি অধ্যায়। সেদিনের কিশোরী ছিল একটি প্রলয়-শিখা, আজ সে হইয়াছে সৃষ্টির হোমশিখা—একই আগুনেরই কি এই দুই রূপ? শ্মশানে যাহা চিতাগ্নিশিখা 'লেহি লেহি বিরাট অম্বর', তাহারই ত' অপর মূর্তি দেখি গৃহমাঝে কুলবধূর শান্ত প্রদীপ শিখায়। যে আগুন একদিন মশাল করিয়া লইয়া ভয়ঙ্করের মুখে আলো ফেলিয়াছিলেন, তাহাকেই আজ আরতির প্রদীপ করিয়া সুন্দরের মুখে প্রসন্ন আলোক-পাত করিয়াছেন। আপনার 'অরুণ-বহ্নি' সেই আরতিরই প্রদীপ-শিখা।

সেদিন পিস্তলের লক্ষ্য ছিল অব্যর্থ, আজ লেখনীও হইয়াছে তেমনি সার্থক। লেখায় কোথাও আত্মপ্রচার নাই, শুধু আছে একটি প্রকাশ মাত্র। নিজেকে আড়াল করিবার আপনার এই শক্তি ও সাধনাকে আমি ঈর্ষা করি। দেখিতেছি, দেবতার অগ্নিই শুধু বহন করিয়া আনেন নাই, দেবতার আশীর্বাদও সঙ্গে আনিয়াছেন।

অতীতের বাংলার বিপ্লবীদের পক্ষ হইতে আপনার এই 'অরুণ-বহ্নি'কে আনন্দ-অভিনন্দন জানাই। বাংলার আজিকার তরুণ-তরুণীগণ "অরুণ-বহ্নি" হইতে যেন নিজ নিজ জীবনে প্রাণতেজ আহরণ করিয়া লয়, ইহাই আমার আজিকার একান্ত প্রার্থনা। ইতি—

অমলেন্দু দাশগুপ্ত

শ্রীযুক্তা শান্তি দাশ
২১-এ, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

বাংলার বিপ্লবী-অভিযান সম্পর্কে অনেক বই বেরিয়েছে। আরও অনেক বেরোবে এবং তার প্রয়োজনও আছে। নিছক কারাকাহিনী বা শাসকের নির্যাতনের ইতিহাস নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে যাঁহারা স্বাধীনতার যজ্ঞে চরম আহুতি দিতে গিয়েছিলেন তাঁদেরও আত্মজীবনী আংশিকভাবে তারই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। সকল ভয়-দুঃখ তুচ্ছজ্ঞান করে, জীবন-মরণ পণ রেখে যারা দোর্দণ্ড প্রতাপ ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিল, তাদের দেহ-মন-প্রাণ কি ধাতুতে গড়া, কি অমৃত রসে-সিঞ্চিত, তার আভাস আমরা ঐ সকল বইয়েই অল্পবিস্তর পেয়েছি।

শ্রীমতী শান্তি দাশের বইয়ে আমরা লেখিকা ও তাঁর সখিসহ-কর্মিণীদের যে ছবি পাই, তাতে ঐ যুগের বাংলার বিপ্লবী মেয়েদের সম্বন্ধে একটি উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট চিত্র মনে ফুটে ওঠে। স্বাধীনতার সংগ্রামে যে মেয়েরা নেমেছিল, আমরা দেখতে পাই কি ভাবে কুসুমতুল্যা বাংলামায়ের মেয়ে যুদ্ধের উদ্দীপনার বশে বজ্রের ন্যায় কঠিন হয়ে উঠেছিল। আমরা দেখি কি ভাবে তাদের তরুণ জীবন, শত বন্ধন ও বাধা উপেক্ষা করে, নিজেকে সতেজ ও অম্লান করে রাখতে সমর্থ হয়েছিল।

ম্যাজিস্ট্রেট স্টীফেন্‌সের জীবনান্ত করার ভার পড়েছিল লেখিকা এবং তাঁর সখী সুনীতির উপর। এই দুরূহ ও দুঃসাহসিক কাজে সফল হওয়ায় তাঁদের অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। কিন্তু এই বইয়ের অতি সরল বিবৃতিতে তাঁর মনের ও চিন্তাধারার যে স্বচ্ছ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তাতে আমরা আশ্চর্য হয়ে দেখি যে ঐ আগুনের ঝলকে তাঁদের কোনরূপ বিকৃতি তো হয়ই নাই বরঞ্চ কিশোরীর মন যেন ক্রমে নির্মলতর হয়েই উঠেছিল। সহজ ভাষায়, অকপটভাবে যে বিবরণ তিনি দিয়েছেন তাতে কৃত্রিমতার লেশ নাই এবং সেইজন্যই এই বই বিশেষভাবে মনোগ্রাহী হয়েছে।

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রতিষ্ঠাবান্ কথা-সাহিত্যিক— সরোজকুমার রায়চৌধুরী

যে সমস্ত সাগ্নিক তরুণ-তরুণী একদা নিঃশব্দে রাত্রির অন্ধকারে দেশোদ্ধারের তপস্যা করেছিলেন, তাঁদের সামনে সেদিন দুঃখদহন ছাড়া আর কিছুই ছিল না, পিছনেও ছিল না খ্যাতি কিংবা সুলভ করতালি। তাঁদের কত যে অন্ধকারে ফুটে অন্ধকারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তাই বা কে জানে, স্বাধীনতা লাভের পরে তাঁদের অনেকে আজ পরিচয়ের আলোকে আসছেন। আমরা শুনতে পাচ্ছি তাঁদের কথা, যাঁদের নইলে ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস সম্পূর্ণ হ'তে পারে না।

'অরুণ-বহ্নি' এমনি একখানি বই যা পড়লে শুধু ভারতের স্বাধীনতা লাভের ইতিহাসের এক অধ্যায়ই নয়, স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীদের অবদানেব একটা বড় অধ্যায়ের সঙ্গেও পরিচয় ঘটবে। লেখিকা কুমিল্লাব ম্যাজিস্ট্রেট স্টীফেন্স হত্যার মামলার অন্যতম আসামী শ্রীমতী শান্তি দাশ।

এই ধরণের বই এই অল্পকালের মধ্যে কয়েকখানিই প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু সেগুলি থেকে এর স্বাতন্ত্র্য হোল, প্রথমত ভাষায়, ভাষা সুন্দর, স্বচ্ছন্দ এবং সাবলীল। দ্বিতীয়ত রচনাশৈলী। তার ফলে বইখানি উপন্যাসের মতো মনোরম হয়েছে। একটি কিশোরী বিপ্লবী মনের গতি ও পরিণতি চমৎকার ফুটে উঠেছে। কারাগারের লৌহ-কপাটের অন্তরালে বিপ্লবী বন্দী-মনের এই যে পথ চলা, এইটেই আমাকে মুগ্ধ করেছে সবচেয়ে বেশি। সেই মন একটি বিশেষ বন্দী-মন নয়। বিপ্লবী মানস সমষ্টি।

এবং 'বন্দরের বন্ধন কাল এবারের মতো' যখন শেষ হোল; চলা তখনও শেষ হল না।। তারপরে "বিদেশী শাসন-শক্তির একদিন অবসান অবশ্যই হবে। তারপরে আসবে জনজীবনের বিপুল অভ্যুত্থান। প্রবুদ্ধ জনশক্তির আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্যে করবে নতুন বিপ্লবের আয়োজন। যতদিন তা সম্পূর্ণ না হয়েছে ততদিন ?"

ততদিন তার যাত্রা

"এক পূর্বাচলের সিংহদ্বার থেকে আরেক উদয়াচলের সিংহদ্বারে, রাত্রির তপস্যায় আসবে দিনের জাগরণ, আবার চৈতন্যের আসবে ক্লান্তি। আসবে দিগন্ত আঁধার করে অমারাত্রি। আবার চলবে রাত্রির সাধনা নতুন দিনের নতুন আলোর সন্ধানে।"

চমৎকার!

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও শিক্ষাবিদ্— ডঃ নীহাররঞ্জন রায়

সম্মানীয়াসু,

আপনার 'অরুণ-বহ্নি' পড়ে খুব তৃপ্তি পেলাম।

কিছুদিন আগেও যে জীবন আমাদের চোখের সামনে বিস্তৃত ছিল, যার দৃপ্ত ভাবময় মহিমা আমাদের ধ্যান ও স্বপ্নের আকাশকে নানা রঙে রঙ্গীন করেছিল, যার ভয় ভাবনা আমাদের দিনের আলো ও রাত্রির অন্ধকারকে নানা উদ্বেগ ও আশংকায় কম্পমান করে রাখতো, আপনি সেই জীবনের একটি অংশকে আপনার আবেগময় ভাষায় অতি উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে। আপনার বইখানি পড়তে পড়তে সেই অতীত দিনগুলোর আস্বাদন যেন আবার নূতন করে ফিরে পেলাম। যে দিন গেছে তা' আর ফিরবে না, জানি, সেই জীবনও আর নয়; তবু তার দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে নিজেদের মনের মধ্যে জীবন ও যৌবনকে আবার জাগিয়ে তোলা যায়, আজকের তরুণ-তরুণীদের চিত্তের মধ্যে ভাবের আবেগ ও জীবনের নূতন স্বপ্নও হয়তো রচনা করা যায়। আপনার এই গ্রন্থখানি তাই করুক, এই কামনা করি।

বিনীত—

শ্রীমতী শান্তি দাস সম্মানীয়াসু }

নীহাররঞ্জন রায়